কিশোর থ্রিলার-২৬

তিন গোয়েন্দার ২৪ তম রোমাঞ্চোপন্যাস

গুহামানব

রকিব হাসান

কিশোরের চোখের সামনে মারা গেল মানুষটা,
রহস্যজনক ভাবে।
গুহামানবকে দেখতে সাইট্রাস গ্রোভে চললো তিন গোয়েন্দা।
ঠাঁই নিলো মাচায়। গভীর রাতে দেখা দিলো
গুহামানব—গায়ে পশুর ছাল, মাথায় লম্বা লম্বা চুল।
মাঠের ওপর দিয়ে চলে গেল ওটা,
হারিয়ে গেল অন্ধকার বনে।
এ কোন আজব জীবকে দেখতে পেলো জিনসী জেনি?
হাতির মতো দাঁত, কপালে একটিমাত্র চোখ...
কোন বাজের ছোঁয়া চোখের পলকে একসঙ্গে
ঘুম পাড়িয়ে দিলো এতগুলো মানুষকে।
চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলো তিন গোয়েন্দা। দুটি
রহস্যের জট খুললো ধীরে ধীরে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

ষোল টাকা

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

গুহামানব

রকিব হাসান

কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে কিংবা উল্টো পাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন, এবং নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দিন।

—প্রকাশক

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি, বা বাস্তব ঘটনার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

—লেখক

এক

'অমন করছেন কেন?' শোনা গেল উদ্বিগ্ন নারীকণ্ঠ।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনছে কিশোর পাশা।

বিকেলের ঘন কুয়াশা, প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ের যানবাহন চলাচলের শব্দকে যেন চেপে ধরে কমিয়ে দিয়েছে। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড আর রাস্তার ধারের বাড়িগুলোর মাঝখানে ভারি হয়ে ঝুলছে কুয়াশার চাদর। কিশোরের ওপরেও পড়ছে যেন এর চাপ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মাঝে বড় একা একা লাগছিলো তার, মনে হচ্ছিলো সমস্ত দুনিয়ায় এতক্ষণ সে-ই ছিল একমাত্র মানুষ।

এই সময় কথা বলে উঠলো কে জানি, জুতোর আওয়াজ এগিয়ে এলো ইয়ার্ডের দিকে।

দুটো ছায়া দেখা গেল, দু'জন মানুষ। ধূসর আলোয় চেহারা অস্পষ্ট। ঝুঁকে হাঁটছেন একজন প্রৌঢ়, পা টেনে টেনে, জুতোর তলা ঘষা লাগছে রাস্তায়। অন্যজন তরুণী, লম্বা চুল এসে পড়ে মুখের অনেকখানি ঢেকে দিয়েছে।

'এই যে, একটা বেঞ্চ।' স্যালভিজ অফিসের কাছে এনে সঙ্গীকে

বসিয়ে দিতে দিতে বললো মেয়েটা, 'চুপ করে বসুন। তখুনি বলেছিলাম, আমি ড্রাইভ করি, আমাকে দিন। শুনলেন না।'

'কি হয়েছে?' এগিয়ে এলো কিশোর।

কপালে হাত রেখে ঘোলা চোখে তাকালেন ভদ্রলোক। 'আমরা···,' মেয়েটার হাত ধরলেন। 'জিজ্ঞেস করো···আমরা কোথায়···'

'হারবারভিউ লেন,' কিশোরকে বললো তরুণী। 'হারবারভিউ লেনটা খুঁজছি আমরা।'

'আরও সামনে যেতে হবে আপনাদের, সানসেট পেরিয়ে তার পর···,' বললো কিশোর। 'উনি কি অসুস্থ নাকি? ডাক্তার ডাকতে···'

'না!' বলে উঠলেন ভদ্রলোক। 'না না, লাগবে না! এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে!'

তার দিকে ঝুঁকলো কিশোর।

ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখ। ঘামছেন। 'খুব দুর্বল লাগছে!' কপাল টিপে ধরলেন। 'মাথাব্যথা করছে। আশ্চর্য! আগে কখনও করেনি!'

'ডাক্তার ডাকছি,' আবার বললো কিশোর।

জোর করে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। 'না না, লাগবে না, সেরে যাবে···,' দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে আবার বসে হেলান দিলেন অফিসের দেয়ালে। ভারি, খসখসে হয়ে উঠেছে শ্বাসপ্রশ্বাস। কুঁচকে গেল কপাল। 'উফ্, ব্যথা!'

তার হাত ধরলো কিশোর। ঠাণ্ডা, ঘামে ভেজা। চোখ স্থির, পাতা পড়ে না।

হঠাৎ যেন বড় বেশি নিরব হয়ে গেল ইয়ার্ডের ভেতরটা।

ভদ্রলোকের কপালে হাত রেখেই ফুঁপিয়ে উঠলো মেয়েটা।

আবার পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। এগিয়ে এলেন মিসেস মারিয়া পাশা, কিশোরের মেরিচাচী।

'কি হয়েছে রে, কিশোর?'

'বোধহয়, মারা গেছেন ভদ্রলোক!'

প্রচুর আলো, সাইরেনের আওয়াজ, মানুষের হুড়োহুড়ি। কুয়াশার মধ্যে পুরো ব্যাপারটাই অবাস্তব লাগছে কিশোরের কাছে, এখানে নয়, যেন অন্য কোনোখানে ঘটে চলেছে ঘটনাগুলো, দূর থেকে দেখছে সে। মেরিচাচীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে সোনালিচুল মেয়েটা। ইয়ার্ডের গেটের কাছে লোকের ভিড়।

স্ট্রেচারে করে লাশটা অ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময় নিরব হয়ে গেল সবাই।

তারপর আবার সাইরেনের তীক্ষ্ণ চিৎকার।

অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে চললো ইয়ার্ডের গাড়ি। ড্রাইভ করছেন মেরিচাচী। তাঁর আর কিশোরের মাঝে বসেছে মেয়েটা।

পুরো ব্যাপারটা এখনও স্বপ্ন মনে হচ্ছে কিশোরের কাছে।

তবে হাসপাতালে পৌঁছে ঘোর কেটে গেল, আবার যেন ফিরে এলো বাস্তবে। উজ্জ্বল আলোকিত করিডরে লোকজনের চলাফেরা। বড় একটা বসার ঘরের বাতাস সিগারেটের ধোঁয়ায় ভারি।

কিশোর, মেরিচাচী আর মেয়েটা বসলো বসার ঘরে। পুরনো ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টানো ছাড়া কিছু করার নেই।

অনেক, অনেকক্ষণ পর এলেন একজন ডাক্তার।

'সরি,' মেয়েটার দিকে চেয়ে বললেন, 'কিছু করতে পারলাম না। ...আপনার কিছু হয় ?'

মাথা নাড়লো মেয়েটা।

'ময়না তদন্ত করতে হবে,' বললেন ডাক্তার। 'না করে উপায় নেই। এটা একটা অস্বাভাবিক কেস, পথে হঠাৎ মারা যাওয়া। সামনে তখন কোনো ডাক্তারও ছিলো না। যা বুঝলাম মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মারা গেছে। কাটলে বোঝা যাবে। ওর আত্মীয়স্বজনকে কোথায় পাওয়া যাবে ?'

আবার মাথা নাড়লো মেয়েটা। 'জানি না। রিসার্চ সেন্টারের ওরা জানতে পারে।' ফোঁপাতে শুরু করলো। একজন নার্স এসে সরিয়ে নিলো তাকে।

বসে আছে কিশোর আর মেরিচাচী।

অনেকক্ষণ পর ফিরে এলো মেয়েটা। 'সেন্টারে ফোন করে এলাম। ওরা আসছে।'

কৌতূহল হচ্ছে কিশোরের, কিসের 'সেন্টার' ? কিন্তু জিজ্ঞেস করলো না কিছু।

'চা খাওয়া দরকার,' মেরিচাচী বললেন। উঠে, মেয়েটার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন কফিশপে।

কিশোর গেল পেছনে।

নিরবে চা খাওয়া চললো কিছুক্ষণ।

'খুব ভালো মানুষ ছিলেন,' অবশেষে নিচু গলায় বললো মেয়েটা। চেয়ে আছে হাতের খসখসে চামড়ার দিকে। নখের মাথা ক্ষয়া, কোনো কোনোটা ভাঙা। জানালো, ভদ্রলোক ডাক্তার ছিলেন, জিনেটিসিস্ট। কাজ করতেন গ্যাসপার রিসার্চ সেন্টারে। প্রজনন-বিদ্যায় এক্সপার্ট, নানারকম জন্তুজানোয়ারের ওপর পরীক্ষা চালাতেন। মেয়েটাও ওখানেই কাজ করে।

'সেন্টারটার নাম শুনেছি,' কিশোর বললো। 'উপকূলের ওদিকে, না ? স্যান ডিয়েগোর কাছে ?'

মাথা ঝোঁকালো মেয়েটা। 'পাহাড়ের মাঝে ছোট একটা শহরে। মরুভূমির দিকে একটা পথ গেছে, ওই পথের কিনারে।'

'জানি। শহরটার নাম সাইট্রাস গ্রোভ।'

এই প্রথম হাসলো মেয়েটা। 'তুমি জানো! অনেকেই জানে না। সেন্টারটার নাম শুনে থাকলেও শহরের নাম জানে না অনেকে।'

'কিশোর অনেক পড়াশোনা করে,' বললেন মেরিচাচী। 'যা পড়ে মনেও রাখে। আমিই তো ওই শহরটার নাম শুনিনি। প্রতিষ্ঠানটার নামও না। কি হয় ওখানে ?'

'বৈজ্ঞানিক গবেষণা,' কিশোর বললো।

কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকালো মেয়েটা।

'প্লাস্টিকের জিনিস বানানোর ফ্যাক্টরি ছিলো ডেনি গ্যাসপারের,' আবার বললো কিশোর। 'কোটি কোটি টাকা কামিয়েছিলেন ব্যবসা করে। ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে ছিলো তাঁর, কিন্তু কোনোদিন হতে পারেননি। তাই, মৃত্যুর আগে উইল করে গেছেন, তাঁর টাকা যেন বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যবহার করা হয়, মানুষের উন্নতির জন্যে।'

'এসবও জানে!' অবাক হয়ে মেরিচাচীর দিকে তাকালো মেয়েটা।

হাসলেন মেরিচাচী। 'বললাম না, অনেক পড়াশোনা ওর।'

'ভালো, খুব ভালো। ও হ্যাঁ, এখনও নামই তো বলা হয়নি আমার। লিলি। লিলি অ্যালজেডো।'

'শুনিনি।'

'শোনার কথাও না। আমি বিখ্যাত কেউ নই।'

'আমি মারিয়া পাশা। ও আমার ছেলে, কিশোর।'

হেসে সামান্য মাথা ঝোঁকালো লিলি।

'হ্যাঁ, গ্যাসপার রিসার্চ সেন্টারের কথা বলো। কিসের গবেষণা হয় ওখানে?' জিজ্ঞেস করলেন মেরিচাচী।

'জন্তুজানোয়ারের,' জবাব দিলো লিলি। 'শাদা ইঁদুর, শিম্পাঞ্জী, ঘোড়া এসব।'

'ঘোড়া? ল্যাবরেটরিতে ঘোড়া রাখে!'

'ল্যাবরেটরিতে না, আস্তাবলে। ওখানে রেখেই পরীক্ষা চালানো হয়। আইসোটোপ ব্যবহার করে কি কি সব পরীক্ষা করতেন ডাক্তার ক্লডিয়াস। ক্রোমসম নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। অনেক চালাক বানিয়ে ফেলা হয়েছে একটা ঘোড়াকে। অংক করতে পারে।'

হাঁ হয়ে গেলেন মেরিচাচী।

কিশোরও অবাক।

'না না, তেমন জটিল অংক না,' বললো লিলি। 'প্রথমে দুটো আপেল সামনে রেখে, পরে আরও তিনটা রাখলে, পাঁচবার মাটিতে পা ঠোকে ওটা। তার বেশি কিছু পারে না। ডাক্তার ক্লডিয়াস বলতেন, ঘোড়ার খুলির আকৃতি নাকি ভালো না, বুদ্ধিমান হওয়ার উপায় নেই। শিম্পাঞ্জীর খুলি অনেক ভালো, অনেক জটিল বিষয়ও

তাই শিখে ফেলে।'

'জানোয়ারকে লেখাপড়া শিখিয়ে ওদেরকে দিয়ে কি করাতে চেয়েছিলেন ডাক্তার?'

'না, কিছু করাবেন না। আসলে, ঘোড়া কিংবা শিম্পাঞ্জীকে কথা বলানোর চেষ্টাও তিনি করছেন না। তিনি চাইছেন মানুষের উন্নতি করতে। কিন্তু সেটা করার জন্যে জানোয়ারের ওপরই তো আগে গবেষণা চালাতে হবে, তাই না? মানুষ কি আর হাসপাতালের গিনিপিগ হতে রাজি হবে?'

কেঁপে উঠলেন মেরিচাচী।

মুখ নামালো লিলি। 'আপনারা অনেক করেছেন। আমি এখন সামলে নিতে পারবো। ডাক্তার রুডলফ আর মিসেস গ্যারেট এসে পড়বেন…'

'ওঁরা না আসা পর্যন্ত আমরা থাকছি,' শান্তকণ্ঠে বললেন মেরিচাচী।

লম্বা, কঙ্কালসার, ধূসর চুলওয়ালা একজন মানুষ ঢুকলেন কফিশপে। ডাক্তার রুডলফ, পরিচয় করিয়ে দিলো লিলি। তাঁর সঙ্গে এসেছে একজন মোটাসোটা মহিলা, বয়েস ষাটের কাছে, চোখের পাতায় নকল পাপড়ি লাগিয়েছে, মাথায় আগুনরঙা নকল চুল। মিসেস গ্যারেট। লিলির হাত ধরে নিয়ে গেল মহিলা। ডাক্তার রুডলফ গেলেন ডাক্তার ক্লডিয়াসকে পরীক্ষা করেছেন যে ডাক্তার তাঁর খোঁজে।

আনমনে মাথা নাড়লেন মেরিচাচী। 'আজব মানুষ! জন্তুজানোয়ারের সিসটেমে গোলমাল করে দিয়ে…,' আবার কেঁপে

উঠলেন তিনি। 'কিশোর, ওই কঙ্কাল ডাক্তারটা কি কাজ করে বলে তোর মনে হয়?'

'কোনো ধরনের গবেষণা।'

ভ্রূকুটি করলেন মেরিচাচী। 'গবেষণা না ছাই! বদ্ধ উন্মাদ ওরা! শেষে না ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বানিয়ে বসে! ভালো হবে না। ন্যাচারাল জিনিসকে বদলে দিতে গিয়ে ভালো করবে না, দেখিস, বিপদ ডেকে আনবে। সারা দুনিয়ার জন্যে!'

দুই

ডাক্তার ক্লডিয়াসের মৃত্যু সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হলো ফলাও করে। স্ট্রোক হয়ে মারা গেছেন বিজ্ঞানী। তাঁর জীবনের কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণীও ছাপা হলো। সব শেষে বলা হলো, জাহাজে করে তাঁর লাশ দেশে নিয়ে যাওয়া হবে কবর দেয়ার জন্যে।

হপ্তাখানেক বাদেই এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বসলো গ্যাসপার সেন্টার। ঝাঁকে ঝাঁকে রিপোর্টার ছুটে গেল সাইট্রাস গ্রোভ শহরে। সেন্টারের একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ, ডাক্তার জর্জ হ্যারিসন নাকি ওই শহরের সীমান্তে পাহাড়ের গুহায় এক প্রাগৈতিহাসিক জীবের কঙ্কাল আবিষ্কার করেছেন।

'দারুণ তো!' খবর পড়ে বলে উঠলো কিশোর।

পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহালক্কড়ের জঞ্জালের নিচে চাপা পড়েছে একটা পুরনো মোবাইল হোম ট্রেলার। তাতে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার।

সে-রকম এই বিকেলে হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা।

'কি দারুণ?' জিজ্ঞেস করলো সহকারী গোয়েন্দা মুসা আমান।

'সাইট্রাস গ্রোভের গুহামানব,' খবরের কাগজটা নামিয়ে রেখে বললো কিশোর। 'আসলে মানুষ কিনা, বোঝা যায়নি এখনও। বয়েস কতো, জানা যায়নি, তবে অনুমান করা হচ্ছে অনেক পুরনো। ডাক্তার হ্যারিসনের মতে ওটা হোমিনিড। মানুষ, কিংবা মানুষের মতো জীব। মানুষের আদিপুরুষ হবে হয়তো।'

'একটু পরেই টেলিভিশনে দেখাবে,' বললো রবিন মিলফোর্ড। ঘড়ি দেখলো। 'পাঁচটায়।'

'টিভি ছাড়বো?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'নিশ্চয়,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

বুকশেলফের ওপরে রাখা ছোট টেলিভিশন সেটটা অন্ করলো মুসা।

ছবি ফুটতেই পর্দা জুড়ে দেখা গেল একটা হাসিখুশি মুখ। ওর নাম এলান ফিউজ। বললো, 'আজ টেলিভিশনে আমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন ডাক্তার জর্জ হ্যারিসন। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় সব চেয়ে পুরনো গুহামানবের কঙ্কাল খুঁজে পেয়েছেন তিনি।'

সরে গেল ক্যামেরার চোখ। মোটা একজন মানুষকে দেখা গেল, গোলগাল চেহারা, ছোট করে ছাঁটা চুল। পাশে বসে আছে ভুঁড়িওয়ালা, বেঁটে আরেকজন। গায়ে কাউবয় শার্ট, কোমরে চওড়া বেল্ট, তাতে কারুকাজ করা চকচকে বক্‌লস্। পায়ে হাইহীল বুট।

'ডাক্তার হ্যারিসনের সঙ্গে এসেছেন মিস্টার কিংসলে ম্যাকস্বার,' আবার বললো এলান ফিউজ। 'ব্যবসা করেন। সাইট্রাস গ্রোভে তাঁর জমিতেই কঙ্কালটা পাওয়া গেছে।'

'রাইট!' রুক্ষকণ্ঠে বলে উঠলেন বিজ্ঞানী। 'ব্যবসায়ীই। লোকের গলা কেটে টাকা নেয়!'

অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বললো এলান ফিউজ, 'ডাক্তার হ্যারিসন এখন আমাদেরকে ফসিলটার কথা কিছু বলবেন।... কোথায় পেয়েছেন, স্যার? কিভাবে?'

চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন প্রত্নতত্ত্ববিদ। 'নেহাত ভাগ্যের জোরেই পেয়েছি বলা যায়। হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। বৃষ্টি সবে থেমেছে তখন। পথের ধারে একফালি জমি, তার পরে পাহাড়। বৃষ্টিতে ঢালের মাটির আস্তর ধুয়ে উঠে গেছে, একটা গর্তের ভেতর থেকে শাদামতো কি যেন বেরিয়ে আছে দেখলাম। অন্ধকার হয়ে এসেছে তখন...'

'তোমার আগেই আমি দেখেছি,' বাধা দিয়ে বললো ম্যাকস্বার। 'আমি দেখার পর...'

'স্পষ্ট দেখা যায় না,' ম্যাকস্বারের কথা না শোনার ভান করে আবার আগের কথার খেই ধরলেন ডাক্তার, 'আলো দরকার। টর্চ আনতে গেলাম সেন্টারে।'

'এসে দেখলে, শটগান হাতে দাঁড়িয়ে আছি আমি,' বললো ম্যাকস্বার। 'ভাগ্য ভালো, বেশি গোলমাল করোনি, নইলে...'

লম্বা শ্বাস টানলেন হ্যারিসন। ধৈর্য রাখতে কষ্ট হচ্ছে। 'ওর জায়গা, তাই ওকে সংগে নিয়েই গেলাম। বৃষ্টিতে মাটি ধসে গিয়ে ছোট একটা গুহামুখ বেরিয়ে পড়েছে। মুখের ঠিক ভেতরেই পড়ে আছে ওটা, কাদায় দেবে আছে বেশির ভাগ। খুলি দেখেই বুঝলাম...'

'পুরনো!' চেঁচিয়ে উঠলো ম্যাকম্বার। 'অনেক পুরনো। হাজার হাজার বছর আগের।'

'খুলিটার কাছেই ছিলো অন্যান্য হাড়, প্রায় পুরো কঙ্কালটাই,' বলে চললেন হ্যারিসন। 'ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখতে পারিনি এখনও। তবে, আফ্রিকায় যেসব পুরনো ফসিল পাওয়া গেছে, সেগুলোর সাথে অনেক মিল আছে।'

'কঙ্কালটা কি মানুষের?' জিজ্ঞেস করলো ফিউজ।

কপালে ভাঁজ পড়লো বিজ্ঞানীর। 'আধুনিক মানুষের সংগে অনেক মিল আছে বটে। 'তবে, পুরোপুরি মানুষ বোধহয় বলা যায় না। আমেরিকায় এযাবৎ যতো হোমিনিড পাওয়া গেছে তার মধ্যে এটা সবচেয়ে পুরনো।'

সামনে ঝুঁকলেন হ্যারিসন। 'বলা হয়, আদিম মংগোলিয়ান যাযাবরদের বংশধর আজকের আমেরিকান ইনডিয়ানরা। বরফ যুগের শেষ দিকে সাইবেরিয়া আর আলাসকা থেকে এসেছিলো ওরা। আট থেকে দশ হাজার বছর আগে। বেশির ভাগ সাগরের পানিই জমে বরফ হয়ে গিয়েছিলো সে-সময়, সমুদ্র সমতল ছিলো অনেক নিচে। সাইবেরিয়া আর আলাসকার মাঝে দূরত্ব এতো কমে গিয়েছিলো, পা বাড়ালেই এক দেশের মানুষ আরেক দেশে ঢুকে পড়তে পারতো। আর তা-ই করেছিলো এশিয়ান যাযাবরেরা। শিকার করতে করতে চলে এসেছিলো নতুন দেশে। শিকার পাওয়া যেতো বেশি, তাই আর ফিরে যায়নি ওরা, ছড়িয়ে পড়ে বিশাল অঞ্চলে। কেউ কেউ চলে যায় একেবারে দক্ষিণ আমেরিকার শেষ মাথায়।

'এসবই অবশ্য বিজ্ঞানীদের অনুমান। কেউ কেউ অন্য কথাও বলেন। বরফ যুগের আগে থেকেই নাকি আমেরিকায় মানুষ ছিলো। কেউ তো আরও বাড়িয়ে বলে আনন্দ পান। বলেন, মানুষের আদি জন্ম এই আমেরিকাতেই, পরে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে গেছে। দেশ ত্যাগ করে চলে গেছে ইউরোপ, এশিয়ায়।'

'সাইট্রাস গ্রোভে পাওয়া ফসিলটা কি প্রমাণ করে?' জিজ্ঞেস করলো ফিউজ।

'এখুনি কিছু বলা যাবে না। কতো পুরনো, তা-ই জানা হয়নি। আমাদের এই কঙ্কালটা...'

'এখানে আমাদের কথাটা আসছে কিভাবে? ওটা তো শুধু আমার,' গোঁয়ারের মতো বলে উঠলো ম্যাকম্বার। 'আমার জায়গায় পাওয়া গেছে। সন্দেহেরও কিছু নেই, ওটা মানুষেরই কঙ্কাল। লাখ লাখ বছর ধরে পড়ে আছে,' এই একটু আগে যে 'হাজার হাজার' বলেছে, বেমালুম ভুলে গেছে।

'পাগল নাকি!' আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না হ্যারিসন, ধমকে উঠলেন।

'পাগলের কি আছে?' গলা আরও চড়ালো ম্যাকম্বার। 'বিজ্ঞানীদের সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু আমি শিওর, এই আমেরিকাতেই প্রথম মানুষের জন্ম হয়েছিলো। গুহায় যে পড়ে আছে, হয়তো ওটাই প্রথম মানুষ, ওরই বংশধর আমরা। গার্ডেন অভ ইডেন হয়তো সাইট্রাস গ্রোভের ধারেকাছেই কোথাও, মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে। ব্যাকারসফিল্ড, কিংবা ফ্রেজনোতে...'

'অ্যাই, তুমি থামবে?' হাত নাড়লেন হ্যারিসন।

'কেন, ঠিক কথাই তো বলছি···'

'ঠিক!' চেয়ার নিয়ে ঘুরে ম্যাকম্বারের মুখোমুখি হলেন ডাক্তার। 'কি করে জানলে, ঠিক? স্টাডিই তো করলাম না···'

'করার দরকারও নেই। আর করতে দিচ্ছে কে তোমাকে? যেখানে পাওয়া গেছে ওটা, সেখানেই থাকবে, যেভাবে পাওয়া গেছে, সেভাবে। মাইক্রোস্কোপের তলায় রাখা তো দূরের কথা, ছুঁতেও দেবো না তোমাকে। তবে হ্যাঁ, লোকে দেখতে চাইলে অবশ্যই দেখাবো।'

'সর্বনাশ! ফসিল নিয়েও ব্যবসা করবে নাকি? শো দেখাবে? আমিও সেটি হতে দিচ্ছি না। কতো পুরনো হাড় ওগুলো···'

'অনেক অনেক পুরনো, সেটা বুঝতে আর স্টাডি করার দরকার হয় না। দেখেই বলে দেয়া যায়। আমার ওই গুহায়ই জন্মেছিলো প্রথম মানুষ, সভ্যতার সূচনা হয়েছিলো। আমাদের সবারই আদিপিতা ওই মানুষটি। তাকে দেখার অধিকার সব মানুষেরই আছে।'

'পয়সা লোটার মওকা পেয়েছো তো, এছাড়া আর কি বলবে, চামার কোথাকার!' রাগে ফেটে পড়লেন হ্যারিসন। 'কি বলছো বুঝতে পারছো?'

'পারছি।' সরাসরি ক্যামেরার চোখের দিকে তাকালো ম্যাকম্বার। 'ওটা পৃথিবীর প্রথম মানুষ, বাবা আদমের হাড়, নিশ্চয় আপনারাও বুঝতে পারছেন। আপনাদের সবারই দেখার অধিকার আছে! আমার গুহায় সবাই আমন্ত্রিত। তবে দয়া করে একটু ধৈর্য ধরুন, একটু সময় দিন আমাকে, জায়গাটাকে ঠিকঠাক

করে রেডি করে ফেলি। তারপর গুহার মুখ খুলে দেবো সবার জন্যে। ক্যালিফোর্নিয়ার সবচেয়ে দর্শনীয় জায়গা হবে···'

'চামারের বাচ্চা চামার!' চেঁচিয়ে উঠে দু'হাত বাড়িয়ে ম্যাকম্বারের ওপর ঝাঁপ দিলেন হ্যারিসন।

দ্রুত সরে গেল ক্যামেরা। এরপর কি ঘটলো, টেলিভিশনের দর্শকেরা আর দেখতে পেলো না। তবে নানারকম শব্দ ভেসে এলো স্পীকারে। কি ঘটছে স্টুডিওতে, বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও।

পর্দায় দেখা দিলো এলান কিউজ। 'প্রিয় দর্শকবৃন্দ, চমৎকার এই অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ করছি। আরও অনেক কথা জানার ছিলো ডাক্তার হ্যারিসনের কাছে, সময়ের অভাবে তা সম্ভব হলো না। এখন দেখবেন ফার্নিচারের রঙের ওপর একটি বিশেষ প্রতিবেদন···'

সুইচ অফ করে দিলো মুসা। 'খাইছে! কাণ্ডটা কি করলো? কিশোর, কে জিতেছে বলে মনে হয়? হ্যারিসন নাকি ম্যাকম্বার?'

সেকথার জবাব না দিয়ে কিশোর বললো, 'ম্যাকম্বার খুব বাজে লোক। হাড়গুলো সরাতে না দিলে···'

'রাখতে পারবে?' বাধা দিয়ে বললো রবিন।

'কেন পারবে না? গুহাটা যদি তার সম্পত্তি হয়? স্পষ্ট বোঝা গেল, দু'জনের মাঝে আগে থেকেই খারাপ সম্পর্ক ছিলো। নইলে হ্যারিসনকে দেখে শটগান আনতে যাবে কেন ম্যাকম্বার? হ্যারিসনও বদমেজাজী। শেষ পর্যন্ত দু'জনের মাঝে কি যে হয় বলা যায় না।'

'রক্তারক্তি কাণ্ড,' মুসা বললো।

'হলে অবাক হবো না। ম্যাকশ্বার চাইবে কঙ্কাল দেখিয়ে পয়সা কামাতে, আর হ্যারিসন চাইবে তুলে নিয়ে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢোকাতে। একজন লোভী, আরেকজন বদমেজাজী। খুনখারাপিও হয়ে যেতে পারে।'

তিন

সেদিনের ওই বিচিত্র সাক্ষাৎকারের পর টেলিভিশনে আর একবারও এলেন না ডাক্তার হ্যারিসন। তবে কিংসলে ম্যাকশ্বারকে কয়েকবারই দেখা গেল। শো-এর ব্যাপারে কথা বললো। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, যেখান থেকে যে গেল, সবাইকেই সাক্ষাৎকার দিলো সে। বসন্ত গিয়ে গ্রীষ্ম এলো। জুলাইয়ের মাঝামাঝি নাগাদ দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার প্রায় প্রতিটি মানুষই জেনে গেল ম্যাকশ্বারের গুহামানবের কথা। এরপর শুরু হলো 'শো'-এর বিজ্ঞাপন। জানানো হলো, আগস্টের শুরুতে সাধারণ দর্শকদের জন্যে খুলে দেয়া হবে গুহামুখ।

জুলাইয়ের শেষ দিকে আরও অনেকের মতো তিন গোয়েন্দাও সাইট্রাস গ্রোভে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো।

হ্যানসনকে খবর দিলো কিশোর।

এক সুন্দর সকালে ইয়ার্ডের গেটে এসে দাঁড়ালো রাজকীয় রোলস রয়েস। চড়ে বসলো তিন গোয়েন্দা।

একটানা দুই ঘণ্টা দক্ষিণে চললো গাড়ি। তারপর পুবে মোড়

নিয়ে উঠে এলো পাহাড়ী পথে। পথের ধারে কোথাও কমলা বাগান, কোথাও ঝোপঝাড়। খোলা মাঠ আর তৃণভূমিও আছে, তাতে চরছে গরু।

আরও আধ ঘণ্টা পর সেন্টারডেল নামে ছোট একটা শহরে ঢুকলো গাড়ি। শহর পেরিয়ে ওপাশে আবার পথ। দুই ধারে ঝোপঝাড়, জঙ্গল, মাঠ—মাইলের পর মাইল একই দৃশ্য। অবশেষে একটা সাইনবোর্ড দেখা গেল। তাতে ইংরেজিতে লেখা : সাইট্রাস গ্রোভে স্বাগতম।

খুবই ছোট শহর, মাত্র কয়েকটা ঘর। একটা সুপারমার্কেট, দুটো পেট্রোল স্টেশন, একটা গাড়ির দোকান, আর একটা ছোট মোটেল আছে, নাম 'রেস্ট আ বিট'। শহরের সুইমিং পুলের পাশ কাটালো গাড়ি। পুরনো, ধুলোয় ঢাকা একটা রেল স্টেশনের ধার দিয়ে এসে পড়লো শহরের মাঝখানে। পথের একধারে একটা পার্ক, আরেক ধারে কিছু দোকানপাট। একটা ব্যাংক, হার্ডওয়্যারের দোকান, ওষুধের দোকান, আর পাবলিক লাইব্রেরি দেখা গেল। শহরটা ছোট বটে, কিন্তু লোকে লোকারণ্য। মোটেলের কপালে নিওন সাইনে 'নো ভ্যাকান্সি' লেখা। সাইট্রাস গ্রোভ কাফের সামনে লম্বা লাইন, খাবার কেনার জন্যে অধীর হয়ে আছে লোকে।

'এ-সবই ওই গুহামানবের কল্যাণে,' বললো রবিন। 'কি ভিড় দেখছো?'

হ্যামবার্গার শপের দিকে চেয়ে হাসলো কিশোর। 'মনে হচ্ছে এই খেয়েই থাকতে হবে।' থামতে বললো হ্যানসনকে। দিন

সাতেক পরে এসে আবার এই জায়গা থেকেই তুলে নিতে বললো।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল হ্যানসন।

একজন দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে, ম্যাকম্বারের বাড়িটা কোথায় জেনে নিলো কিশোর।

সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল বাড়িটা। সামনে গাড়িবারান্দা, ছোট লন। এককালে সুন্দর থাকলেও এখন আর তেমন নেই। দেয়ালে রঙ করা হয়নি অনেকদিন, জানালার পর্দা পুরনো। কিছু কিছু পাল্লার শার্সি উধাও। অযত্নে বেড়ে উঠেছে বাগানের ঘাস।

'আমি তো ভেবেছিলাম বড়লোক,' রবিন বললো। 'মনে করেছি, হার্ডওয়্যার আর গাড়ির দোকানটা ওরই।'

'হলেই বা কি?' কিশোর বললো। 'যা শহর, লোক আছে কয়জন, আর বেচাকেনাই বা কি হবে?'

গাড়িবারান্দায় একটা নোটিশ, তাতে লেখা রয়েছে : যারা রাতে থাকার জায়গা চায় তারা যেন বাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে এগোয়। নির্দেশ পালন করলো ছেলেরা। দেখলো, একটা পথের ধার থেকে শুরু হয়েছে মাঠ, তার ওপাশে বন। মূল বাড়িটার কাছে একটা গোলাঘর, বয়েসের ভারে ধুঁকছে, বিবর্ণ। মাঠের ধারে পাহাড়। পাহাড়ের কোলে চমৎকার একটা নতুন বিল্ডিং। ছিমছাম, সুন্দর, আধুনিক। একটা জানালাও নেই। ডাবল ডোর দরজার ওপরে সাইনবোর্ড : গুহামানবের গুহায় স্বাগতম।

'বাহ্!' মুসা বললো। 'মাল কামানোর বেশ ভালো ব্যবস্থা হয়েছে।'

'কিছু চাই?' পেছনে নরম গলায় কথা শোনা গেল।

দেখেই চিনলো কিশোর। 'আরে, লিলি অ্যালজেডো, আপনি।'

'ও, কিশোর। তোমরাও দেখতে এসেছো। ...তা তোমার মা কেমন আছেন?'

হাসলো কিশোর। 'ভালো।'

কথা শুনেই বোধহয়, বাড়ির পেছনের দরজা খুলে বেরোলো একজন মোটা খাটো মহিলা, পাতলা চুল। 'কে রে, লিলি?...কি চায়?'

'জেলডা আন্টি, ও কিশোর পাশা,' পরিচয় করিয়ে দিলো লিলি। 'ওর কথাই বলেছিলাম। ওরা সাহায্য না করলে খুব বিপদ হতো সেদিন রকি বীচে।'

মুসা আর রবিনের পরিচয় দিলো কিশোর।

'গুহামানব দেখতে এসেছে,' লিলি বললো। 'আন্টি, ওদের থাকার ব্যবস্থা করা যায় না?'

মহিলার পেছনে উঁকি দিলো আরেকজন। কিংসলে ম্যাকস্বার। আবার পরিচয় করানোর পালা।

'তোমাদের কথা লিলির কাছে শুনেছি,' বললো ম্যাকস্বার। 'জায়গা দিতে পারলে খুশিই হবো। কিন্তু বাড়িতে তো হবে না, অবশ্য, গোলাঘরের মাচায় শুতে পারো। ঘরের পেছনে অনেক জায়গা, ব্যবহার করতে পারবে। একটা পানির কলও আছে ওখানে।' কুঁচকে এলো লোকটার ধূর্ত চোখের পাতা। 'ভাড়াও খুব কম নেবো তোমাদের কাছ থেকে। একরাতের জন্যে, এই দশ ডলার। কি বলো, অ্যাঁ? তিনজনের জন্যে।'

'কি বলছো, আংকেল!' চেঁচিয়ে উঠলো লিলি।

'তুমি চুপ করো মেয়ে,' বলেই স্ত্রীর দিকে তাকালো ম্যাকস্বার। চোখ সরিয়ে নিলো জেলডা।

'দশ ডলারে এখানে কোথাও থাকার জায়গা পাবে না,' আবার বললো ম্যাকস্বার।

'বনের মধ্যে গিয়ে থাকলেই তো পারি?' কিশোরের দিকে চেয়ে বললো রবিন। 'পয়সাও লাগবে না...'

'না না, সেটা উচিত হবে না,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলো ম্যাকস্বার। 'জায়গাটা নিরাপদ না। যখন তখন আগুন লাগে। শুকনো মৌসুম। দাবানলের ভয় আছে।'

মানিব্যাগ থেকে দশ ডলারের একটা নোট বের করে বাড়িয়ে ধরলো কিশোর। 'নিন। আজ রাতের ভাড়া।'

'গুড,' নোটটা নিয়ে পকেটে ভরলো ম্যাকস্বার। কণ্ঠে খুশির আমেজ। 'লিলি, যাওতো, পানির কলটা দেখিয়ে দিয়ে এসো।'

'দেখো ছেলেরা, সাবধান থাকবে,' হুঁশিয়ার করলো মিসেস ম্যাকস্বার। 'ঘরে আগুনটাগুন লাগিয়ে দিও না আবার।'

'সিগারেট খাও নাকি?' জিজ্ঞেস করলো ম্যাকস্বার।

'না,' মুখ গোমড়া করে জবাব দিলো মুসা। 'এই কিশোর, এদের বিরক্ত করছো কেন? বনে না থাকি, পার্কে গিয়েই তো...'

'পার্কে থাকা নিষেধ,' বাধা দিয়ে বললো ম্যাকস্বার। মুচকি হেসে ঘরে ঢুকে গেল সে।

ছেলেদের নিয়ে চললো লিলি। রাগে, লজ্জায় লাল হয়ে গেছে গাল। 'খুব খারাপ লাগছে আমার। দেখো, কালও যদি থাকো, টাকা দেবে না। আমার কাছে কিছু আছে। চাইতে এলে ভাড়াটা

আমিই দিয়ে দেবো আংকেলকে।'

'আরে, রাখুন তো। ওসব ভেবে মন খারাপ করবেন না,' কিশোর বললো। 'টাকাটা কোনো ব্যাপার না।'

'কিন্তু আংকেল যখন এরকম ছ্যাঁচড়ামি করে না, আমার খুব খারাপ লাগে,' তিক্ত কণ্ঠে বললো লিলি। 'কিছু বলতেও পারি না···আমাকে মানুষ করেছে ওরাই। কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে আমার বাবা-মা। আমার তখন আট বছর বয়েস।'

বিষণ্ণ কণ্ঠে কিশোর বললো, 'আপনার আর আমার অনেক মিল। আমার বাবা-মাও কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।'

'তাই নাকি? তাহলে মেরিআন্টি···'

'আমার চাচী। নিঃসন্তান। মায়ের আদর দিয়ে মানুষ করছে আমাকে। অপরিচিত কারো কাছে আমাকে ছেলে বলেই পরিচয় দেয়।'

'ও!' দীর্ঘশ্বাস ফেললো লিলি।

ছেলেরা ভাবছে, ম্যাকম্বার দম্পতি কী যত্ন নেয় এতিম মেয়েটার? তার শীর্ণ হাত-পা, রুক্ষ চুল, রক্তশূন্য চেহারা···'

গোলাঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো লিলি। পেছনে তিন গোয়েন্দা।

ধুলোয় মলিন ঘরের মাঝে ঝকঝকে নতুন একটা পিকআপ ট্রাক আর একটা ফোরডোর সিডান কার, বড় বেমানান। ঘরের কোণায় কোণায় জমে আছে জঞ্জাল, পুরনো হলদেটে খবরের কাগজের স্তূপ, বাক্স। ওয়ার্কবেঞ্চের ওপরে আর পাশে পড়ে রয়েছে মরচে ধরা যন্ত্রপাতি—করাত, হাতুড়ি, বাটাল, এসব।

পেছনের দেয়ালের কাছ থেকে মাচায় উঠে গেছে কাঠের সিঁড়ি।

চালার নিচের অন্ধকার, গুমোট মাচায় উঠে এলো ছেলেরা। একধারে জানালা একটা আছে বটে, তবে ধুলো আর মাকড়সার জালে এমনই মাখামাখি, আলো আসার পথও নেই। ধাক্কা দিয়ে পাল্লা খুললো কিশোর। হুড়মুড় করে এসে ঢুকলো বাইরের তাজা, ঠাণ্ডা বাতাস।

'তোয়ালে-টোয়ালে কিছু লাগবে?' নিচ থেকে জিজ্ঞেস করলো লিলি।

'না,' মুসা জবাব দিলো। 'দরকারী জিনিস সব নিয়ে এসেছি আমরা।'

মইয়ের গোড়ায় দাঁড়িয়েই আছে লিলি। যেতে ইচ্ছে করছে না যেন। আবার বললো, 'একটু পরেই সেন্টারে যাবো আমি। জানোয়ারগুলো দেখতে চাইলে তোমরাও আসতে পারো।'

ওপর থেকে মাচার ফোকর দিয়ে মুখ বের করে বললো কিশোর, 'আর্কিওলজিস্ট ভদ্রলোককে চেনেন নিশ্চয়। গুহামানবকে যিনি পেয়েছেন?'

'ডাক্তার হ্যারিসন? চিনি। দেখা করতে চাও? বাড়ি থাকলে ওনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি।'

'তাহলে তো খুব ভালো হয়। কঙ্কালটার বয়েস কতো জানা গেছে? কি করে গুহায় এলো?'

মুখ বাঁকালো লিলি। 'সবাই ওটার কথা জানার জন্যে পাগল। বিচ্ছিরি দেখতে। নিশ্চয় গরিলার মতো ছিলো চেহারা।···খবর-

দার ! গুহার ধারেকাছে যেও না। শটগান নিয়ে পাহারা দেয় আংকেল। রান্নাঘরের দরজার পেছনে লুকিয়ে বসে থাকে। গুলি খেয়ে মরবে শেষে।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। ভীষণ বদরাগী লোক।...ওই গুহামানব নিয়ে কিছু একটা ঘটবে এখানে, বলে দিলাম, দেখো। খুব খারাপ কিছু।'

চার

গ্যাকম্বারের বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে একটা পাহাড়ের ওপর ছোটবড় কিছু বাড়ির সমষ্টি গ্যাসপার রিসার্চ সেন্টার। ঘন সবুজ লন। কাঁটাতারের বেড়া নেই, এধরনের সেন্টারে সাধারণতঃ যেমন থাকে। তবে পাথরের গেটপোস্ট আছে, তাতে শক্ত পাল্লা। লিলির পেছন পেছন গাড়িপথ ধরে বাড়ির গেটে এসে দাঁড়ালো তিন গোয়েন্দা।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকলো ওরা। সদর ফটকে কোনো পাহারা নেই। দরজায় টোকা দেয়ারও প্রয়োজন মনে করলো না লিলি, ঠেলা দিয়ে খুলে ফেললো।

কোনো এনট্রি হল নেই। বড় একটা লিভিং রুমে সরাসরি এসে ঢুকেছে ওরা। ঘরেই আছেন জর্জ হ্যারিসন। পায়চারী করছিলেন, ওদের দেখে থামলেন।

তিন গোয়েন্দার সংগে পরিচয় করিয়ে দিলো লিলি।

ভ্রুকুটি করলেন ডাক্তার। 'ও, তোমরাও ভণ্ডামী দেখতে এসেছো ?'

'গুহামানবকে দেখতে, স্যার,' জবাব দিলো মুসা।

'কি যে কাণ্ড! পাগল হয়ে গেছে লোক।' আবার পায়চারী শুরু করলেন হ্যারিসন। 'দলে দলে আসবে! মাড়িয়ে শেষ করে দিয়ে যাবে সবকিছু। পাহাড়ের নিচে নিশ্চয় আরও ফসিল আছে। আমার বন্দুক থাকলে...'

'সব্বাইকে গুলি করে মারতে,' বললো শান্ত একটা কণ্ঠ।

ঘুরে তাকালো ছেলেরা।

লম্বা, বিষণ্ণ চেহারার একজন লোক ঘরে ঢুকেছেন। কঙ্কালসার দেহ। কিশোর চিনলো। রকি বীচ হাসপাতালে দেখেছে। সেদিন পরেছিলেন মলিন একটা ধূসর স্যুট। আজ পরনে রঙচটা খাকি হাফপ্যান্ট আর পোলো শার্ট। ফায়ারপ্লেসের ধারে একটা আর্ম-চেয়ারে বসে তাকিয়ে রইলেন নিজের হাড়সর্বস্ব হাঁটুর দিকে।

'ডাক্তার রুডলফ,' লিলি বললো, 'কিশোর পাশার সংগে নিশ্চয় পরিচয় আছে?'

অবাক হলেন ডাক্তার। 'আছে?'

'রকি বীচ হাসপাতালে যেদিন মারা গেলেন ডাক্তার ক্লডিয়াস,' লিলি মনে করিয়ে দিলো, 'আমাকে সাহায্য করেছিলো ও। আপনি যখন ঢুকলেন তখনও ছিলো। মনে নেই?'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে,' হাসলেন ডাক্তার। হাসলে তাঁর বয়েস কম মনে হয়। 'কেমন আছো?'

'ভালো,' মাথা কাত করলো কিশোর।

'ডাক্তার রুডলফও আর্কিওলজিস্ট,' লিলি জানালো। 'একটা বই লিখছেন।'

আবার হাসলেন ডাক্তার।

'ক্রুয়াল ম্যানও তো আপনারই লেখা, তাই না?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

ওপরে উঠে গেল রুডলফের ভুরু। 'তুমি ওটা পড়েছো!'

'হ্যাঁ। লাইব্রেরিতে পেয়েছিলাম। দারুণ লেখা, তবে মন খারাপ হয়ে যায়। এভাবে সব সময়ই যদি মানুষকে মানুষের সংগে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়...'

'খুব খারাপ, তাই না?' কিশোরের বাক্যটা শেষ করলেন রুডলফ। 'জন্ম থেকেই আমরা নিষ্ঠুর, পৈশাচিকতা ভালোবাসি। সেটাই আমাদের, মানে মানুষের বৈশিষ্ট্য। বড় মগজ থাকায় আর সোজা হয়ে হাঁটতে পারি বলে এসব করার আরও সুবিধে হয়েছে।'

'ফালতু কথা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ডাক্তার হ্যারিসন। 'ভায়োলেন্স মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়, জন্ম থেকে নিষ্ঠুর হয় না মানুষ। সব তালগোল পাকিয়ে ফেলছো তুমি।'

'তাই নাকি?' বাঁকা চোখে সহকর্মীর দিকে তাকালেন রুডলফ। 'বেশ, ডেনি গ্যাসপারের কথাই ধরা যাক। মানুষের উন্নতি চাই-তেন তিনি, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে এই গ্যাসপার সেন্টার। কিন্তু তাই বলে কি তাকে নিষ্ঠুর বলা যাবে না? নিশ্চয় যাবে। রীতি-মতো খুনী ছিলেন। বিগ-গেম হান্টার ছিলেন। শিকার মানেই খুন, আর খুন মানেই পৈশাচিকতা, কিংবা ভায়োলেন্স, যা-ই বলো।' ম্যানটেলপিস-এর দিকে দেখালেন। সেখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে শিংওয়ালা একটা জন্তুর স্টাফ করা মাথা, মৃত চোখ-দুটো চেয়ে আছে জানালার দিকে। কয়েকটা বুককেসের ওপরের

দেয়ালে সাজানো রয়েছে বাঘ, পুমা আর একটা বিশাল জল-মহিষের মাথা। ভালুক, সিংহ আর চিতার চামড়া আছে কয়েকটা।

'এখন যুগ পাল্টেছে, তাই মানুষের পরিবর্তে জন্তু শিকার করে তার মাথা কিংবা চামড়া এনে ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়। বহুকাল আগে কি হতো? অন্য কোনো শিকার না পাওয়া গেলে মানুষ মানুষকেই মারতো। আমরা যেমন মুরগীর ঠ্যাঙ চুষি, তেমনি করে মানুষের হাড় চুষতো সেকালের মানুষেরা।'

'সব গুবলেট করে ফেলছো!' খেঁকিয়ে উঠলেন হ্যারিসন।

'তারমানে ঠিকই বলছি,' হাত তুললেন রুডলফ। 'তোমার রেগে যাওয়া মানেই, নিজের যুক্তির স্বপক্ষে জবাব খুঁজে না পাওয়া।'

ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকলেন টাকমাথা, ছোটখাটো একজন মানুষ। 'আবার শুরু করেছো! নাহ্, তোমাদের নিয়ে আর পারা গেল না। মানুষ নিষ্ঠুর হলো, না কি হলো, তাতে কি এসে গেল?'

আগন্তুকের পরিচয় দিলো লিলি, 'ইনি ডাক্তার এনথনি রেড-ম্যান, ইমিউনোলজিস্ট। অনেকগুলো শাদা ইঁদুর আছে ওঁর। ...স্যার, এদেরকে ওগুলো দেখাতে চাই। দেখাবো?'

'দেখাও, তবে হাত দিতে পারবে না,' অনুমতি দিলেন ডাক্তার রেডম্যান।

'না, দেবো না।'

আরেকটা হলরুমে ঢুকলো ছেলেরা।

'ওয়ার্করুম, ল্যাবরেটরি, সব জায়গায়ই যাওয়া যায় এখান থেকে।' ওই যে, একটা দরজা দেখালো লিলি, 'ওটার ওপাশে ডাক্তার রেডম্যানের ল্যাবরেটরি।'

দরজা ঠেলে ছোট একটা ওয়াশরুমে ঢুকলো ওরা। চারটে সার্জিক্যাল মাস্ক বের করে একটা নিজে নিয়ে বাকি তিনটে তিন-জনকে দিলো লিলি। 'পরে নাও।' মাস্ক মুখে লাগিয়ে ভারি একজোড়া রবারের দস্তানা পরে নিলো।

দেখাদেখি তিন গোয়েন্দাও মুখোশ পরলো।

আরেকটা দরজা ঠেলে বড় একটা ঘরে এসে ঢুকলো ওরা। রোদের আলোয় আলোকিত। দেয়াল ঘেঁষে রাখা আছে সারি সারি কাঁচের খাঁচা। ভেতরে অসংখ্য শাদা প্রাণী ছুটাছুটি করছে।

'বেশি কাছে যেও না,' সাবধান করলো লিলি, 'ছুঁয়ো না।' ইঁদুরগুলোকে খাওয়ানোয় মন দিলো সে।

'এগুলো বিশেষ ধরনের ইঁদুর,' খানিক পরে আবার বললো। 'ওদের ইমিউনিটি নষ্ট করে দিয়েছেন ডাক্তার রেডম্যান…'

'এক মিনিট,' হাত তুললো মুসা। 'ইমিউনিটিটা কি?'

'এক কথায় ব্যাখ্যা করা যাবে না,' বললো রবিন। 'রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা জাতীয় একটা ব্যাপার।'

'হ্যাঁ,' বললো লিলি। 'অনেকটা তা-ই। ছুঁলে ওগুলোর মধ্যে রোগ সংক্রমণ ঘটতে পারে, খুব সহজে। ইনফেকশন প্রতিরোধের ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে এখন ওদের।'

'হুঁ,' মাথা দোলালো মুসা। 'তারমানে রোগে ধরলেই মরবে?'

'কয়েকটা ইতিমধ্যেই মরেছে,' লিলি জানালো। 'জীবদেহে একধরনের বিশেষ কোষ তৈরি হতে থাকে, যেগুলো রোগজীবাণু খেয়ে ফেলে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ওই কোষই দেহের ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। ওই ইমিউন রিঅ্যাকশন থেকেই তখন বাতে ধ

মানুষকে, পাকস্থলীতে ঘা হয়, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাগলামী রোগেও ধরে।'

'খাইছে!' আতঙ্কে উঠলো মুসা। 'আল্লারে! কি সাংঘাতিক!'

'ইমিউনিটি না থাকলে বসন্ত রোগ ঠেকাতে পারবো না আমরা,' রবিন বললো। 'হাম হবে...'

'জানি,' বললো লিলি। 'সেজন্যেই ইমিউনিটি নিয়ে গবেষণা করছেন ডাক্তার রেডম্যান, যাতে ইচ্ছেমতো ইমিউন কন্ট্রোল করতে পারি আমরা, রিঅ্যাকশন না হয়, অন্য রোগে আক্রান্ত না হই...'

'চমৎকার আইডিয়া!' কিশোর বললো। 'বই-টই লিখছেন নাকি?'

'এখনও না। তবে ইচ্ছে আছে। ডাক্তার রুডলফ লিখছেন, ডাক্তার হ্যারিসনও লিখছেন তাঁর ঘরে কেবিনেটে বন্দি মানুষটাকে নিয়ে।'

'কেবিনেটে বন্দি?' ভুরু কোঁচকালো রবিন।

'মানুষের ফসিল,' বুঝিয়ে বললো লিলি। 'আফ্রিকায় পেয়েছিলেন হাড়গুলো। জোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে আস্ত কঙ্কাল বানিয়ে ফেলেছেন।'

'এখানকার গুহায় পাওয়া গুহামানবকে নিয়েও তাই করতে চান বোধহয়?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ,' লিলির কণ্ঠে অস্বস্তি, 'কিন্তু ম্যাকম্বার আংকেল দিতে রাজি না।'

ইঁদুরগুলোকে খাওয়ানো শেষ হলে আবার ওয়াশরুমে ফিরে

এলো ওরা। মাস্ক আর গ্লাভস খুলে সিংকের পাশে একটা ঢাকনাওয়ালা পাত্রে ফেললো লিলি। তিন গোয়েন্দাও তাদের মাস্ক খুলে রাখলো। তারপর এসে ঢুকলো আবার হলরুমটায়।

'এবার শিম্পাঞ্জীগুলো দেখবে, চলো,' লিলি বললো।

একটা করিডরের শেষ মাথায় ডাক্তার ক্লডিয়াসের ল্যাবরেটরি। রেডম্যানের ঘরটার চেয়ে বড়। জানালার কাছে একটা খাঁচায় দুটো শিম্পাঞ্জী গম্ভীর হয়ে বসে আছে। খাঁচার ভেতরে নানারকমের খেলনা রয়েছে। ছোট একটা ব্ল্যাকবোর্ড আছে, রঙিন চক দিয়ে ওটাতে লেখে ওরা।

লিলিকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো শিম্পাঞ্জী দুটো। খাঁচার ফাঁক দিয়ে হাত বের করলো বড়টা।

'আরে রাখ, রাখ, খুলছি!' এগিয়ে গিয়ে খাঁচার দরজা খুলে দিলো লিলি। শিম্পাঞ্জীটা বেরিয়ে এসে তার হাত ধরলো।

'ভালো আছিস?' জিজ্ঞেস করলো লিলি। 'রাতে ভালো ঘুম হয়েছে?'

চোখ বুজে মানুষের মতোই মাথা কাত করে সায় জানালো শিম্পাঞ্জীটা। তারপর দেয়ালঘড়ি দেখিয়ে এক আঙুলে বাতাসে একটা অদৃশ্য চক্র আঁকলো।

'ও, অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিস।'

তিড়িং করে মস্ত এক লাফ দিয়ে হাত তালি দিলো জানোয়ারটা।

দ্বিতীয় শিম্পাঞ্জীটাও বেরিয়ে এসে একটা টেবিলে উঠে বসেছে।

'এই, খবরদার!' ধমক দিলো লিলি।

তাকে রাখা কেমিক্যালের বোতলগুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওটা। লাভ হবে না তাকিয়ে, বুঝতে পেরে টেবিল থেকে খালি একটা বীকার নিয়ে লাফ দিয়ে নামলো মাটিতে। খেলতে শুরু করলো।

রেফ্রিজারেটর থেকে ফল আর দুধ বের করলো লিলি, তাক থেকে বড় বাসন নামালো।

'তোমার কথা বোঝে ওরা?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'বোঝে। ইঙ্গিতে অনেক কিছু বোঝাতেও পারে। ডাক্তার ক্লডিয়াস শিখিয়েছেন। বোবা ইস্কুলে যেভাবে সাইন ল্যাঙ্গোয়েজ শেখানো হয়, তেমনি।'

'ডাক্তার সাহেব তো নেই,' রবিন বললো। 'এখন এগুলোর কি হবে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো লিলি। 'জানি না। বোর্ডের মেম্বাররা আগামী মাসে মিটিঙে বসে ঠিক করবেন। কয়েকটা শিম্পাঞ্জী ইতিমধ্যেই মরে গেছে। অনেক দাম দিয়ে কিনে আনা হয়েছিলো ওগুলোকে।' ছলছল করছে তার চোখ।

টেবিলে খাবার দিলো লিলি। ছোট চেয়ারে উঠে বসে খেতে শুরু করলো শিম্পাঞ্জীগুলো।

খাওয়া শেষ হলে ওগুলোকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার খাঁচায় ভরলো লিলি। চেঁচামেচি, বাদপ্রতিবাদ অনেক করলো ওরা, বড়টা তো লিলির হাতই আঁকড়ে ধরে রাখলো। খাঁচায় বন্দি থাকতে রাজি নয়।

'থাক,' কোমল গলায় বললো লিলি, 'আমি আবার আসবো।'

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে কিশোর, ল্যাবরেটরিতে ঢোকার পর লিলির আচরণ অন্যরকম হয়ে গেছে। অথচ ম্যাকস্বারের বাড়িতে থাকার সময় মনমরা হয়ে থাকে।

'ডাক্তার ক্লডিয়াসকে মিস করছে ওরা,' লিলি বললো। 'আমিও। এখানে ঢুকলে তাঁর জন্যে খারাপ লাগে। খুব ভালো মানুষ ছিলেন। হাসিখুশি। অসুস্থ হয়েও হাসি যায়নি মুখ থেকে।'

'আগে থেকেই অসুস্থ?' কিশোর ধরলো কথাটা। 'আমি তো ভেবেছিলাম, রকি বীচে হঠাৎ করেই স্ট্রোকটা হয়েছে।'

'হঠাৎ করেই হয়েছে। তবে কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দিয়েছিলো এখানে থাকতেই। চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়তেন। হয়তো শিম্পাঞ্জী-গুলো তখন বাইরে রয়েছে, জিনিসপত্র তছনছ করছে, খেয়াল করতেন না। সেদিন তাঁর সংগে আমি গিয়েছিলাম, তার কারণ ...একা এতোটা পথ যেতে পারবেন না, বুঝতে পারছিলাম।'

'কেন গিয়েছিলেন রকি বীচে?' এমনি, সাধারণ কথাচ্ছলেই প্রশ্নটা করলো কিশোর, কিছু ভেবে নয়।

কিন্তু চমকে উঠলো লিলি, লাল হয়ে গেল গাল।

'ইয়ে...তিনি...আমি জানি না,' আরেক দিকে মুখ ফেরালো লিলি। দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করলো।

চট করে একে অন্যের দিকে তাকালো মুসা আর কিশোর।

'ব্যাপার কি?' নিচু গলায় বললো মুসা।

নাক কুঁচকালো কিশোর। 'মিথ্যে বলছে।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার। 'কিন্তু কেন? কি লুকানোর চেষ্টা করছে?'

পাঁচ

লিভিংরুমে ফিরে দেখা গেল, বিজ্ঞানীদের একজনও নেই। সোফার কভার ঝেড়ে, থাবড়ে সোজা করছে মোটা এক মহিলা। কালোচুল এক তরুণ জানালা-দরজার কাঁচ মোছায় ব্যস্ত।

'ও, লিলি,' মহিলা বললো। 'তোমার বন্ধু নাকি? ভালো।'

মহিলাকে চিনলো কিশোর। মিসেস গ্যারেট। মাথায় এখন একটা ছাই-সোনালি উইগ। তবে চোখের পাপড়ি আগেরগুলোই আছে।

ছেলেদের সংগে মহিলার পরিচয় করিয়ে দিলো লিলি।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে,' কিশোরের সংগে হাত মেলাতে মেলাতে বিচিত্র শব্দ করলো মিসেস গ্যারেট, ছানাকে আদর করার সময় মুরগী যেমন কঁককঁক করে অনেকটা তেমনি। 'তুমি সেই ছেলেটাই তো। খুব ভালো ছেলে। মানুষের খারাপ সময়ে যে উপকার করে সে-ই তো ভালো মানুষ। জানো, তখন হাসপাতালে হাল-এর কথা খুব মনে পড়ছিলো।' ও, হাল কে চেনো না? হাল গ্যারেট। আমার স্বামী, শেষ স্বামী। ওর মতো মানুষই হয় না।'

বকবক করে চললো মিসেস গ্যারেট।

কয়েক মিনিটেই জানা হয়ে গেল ছেলেদের, মোট তিনজন স্বামী বদল করেছে মহিলা। প্রথমজন ছিলো বীমার দালাল, দ্বিতীয়জন চিত্রপরিচালক, আর তৃতীয়জন, তার পছন্দের মানুষ এবং শেষ স্বামী—একজন পশুচিকিৎসক।

'সব মানুষই ভালো হয় না,' বলে গেল মিসেস গ্যারেট, 'সবাই বাঁচেও না বেশিদিন। আমার স্বামীদের বেলায়ও তাই হয়েছে। কম বয়েসে মারা গেল। তারপর এসে এখানে হাউজকীপারের চাকরি নিলাম। ডাক্তারগুলোকে প্রথম প্রথম খুব ভয় পেতাম, একেকজনের একেক রকম স্বভাব, অদ্ভুত। আবোলতাবোল বকে, আর সুযোগ পেলেই বসে বসে গালে হাত রেখে ভাবে। বলো দেখি কি কাণ্ড! তবে একবার ওদের স্বভাব বুঝে ফেললে আর কোনো অসুবিধে নেই। বলে একটা করে আরেকটা। ডাক্তার রুডলফের কথাই ধরো। মুখে নিষ্ঠুরতা, পৈশাচিকতা, খুন, এসব ছাড়া আর কোনো কথা নেই। অথচ একটা মাছি মারতে পারবে না, মারলে কেঁদে বুক ভাসাবে। ডাক্তার হ্যারিসন হয়েছে তার উল্টো। খুনটুন এসব কথা শুনলেই আঁতকে ওঠে। অথচ যা বদমেজাজী, মানুষ খুন করতেও হাত কাঁপবে বলে মনে হয় না। ...লিলি, ওকে তোমার আংকেলের সামনে বেশি যেতে দিও না। কখন যে কি ঘটাবে কে জানে।'

'আমি বুঝি,' মিনমিন করে বললো লিলি।

কাজে মন দিলো আবার মিসেস গ্যারেট।

ভেজা ব্রাশ বালতির পানিতে ফেলে ঘুরে দাঁড়ালো তরুণ। লিলিকে বললো, 'আমার সংগে পরিচয় করালে না?' এগিয়ে এলো।

লজ্জা পেলো লিলি। 'ও, হ্যাঁ, কিশোর, ওর নাম বিল। বিল উইলিয়ামস। সেন্টারে কাজ করে, আমার মতো।'

হেসে হাত বাড়িয়ে দিলো বিল। 'হাই। পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।...লিলি, গতরাতের জন্যে আমি লজ্জিত। টায়ার পাংচার হয়ে আটকে গিয়েছিলাম···আমার জন্যে বেশি অপেক্ষা করোনি তো?'

'ওসব কথা থাক,' বলে ছেলেদের নিয়ে আরেকটা দরজার দিকে রওনা হলো লিলি।

লাইব্রেরিতে ঢুকলো ওরা। তারপর ছোট একটা চৌকোণা ঘর পার হয়ে বেরিয়ে এলো বাড়ির একপ্রান্তে।

ওখান থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরে আস্তাবল। নিরবে সেদিকে এগোলো লিলি।

প্রিয় ঘোড়াটার কাছে এসে মেজাজ ভালো হয়ে গেল তার। ঘোড়ার নাম রেখেছে 'পাইলট'। মুসার বেশ পছন্দ হলো নামটা।

গলায় হাত বোলাতে বোলাতে নিচু স্বরে ওটার সংগে কথা বললো লিলি। চারটে আপেল মাটিতে রেখে জিজ্ঞেস করলো, 'ক'টা?'

চার বার পা ঠুকলো ঘোড়াটা।

'লক্ষী ছেলে,' বলে চারটে আপেলই পাইলটকে উপহার দিয়ে দিলো লিলি।

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। লিলি রইলো ভেতরে, ঘোড়ার সেবাযত্ন শেষ হতে সময় লাগবে।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে শহরের দিকে চললো ছেলেরা, খিদে পেয়েছে।

রাস্তায় লোকের ভিড় আরও বেড়েছে। স্ন্যাকসের দোকানের সামনে এসে লাইন দিতে হতে হলো তাদের। সাধারণ হ্যামবার্গার জোগাড় করতেই লেগে গেল এক ঘন্টার বেশি।

খাওয়া সেরে শহর দেখতে চললো। দোকানীদের দম ফেলার অবকাশ নেই। আগামী দিন গুহামুখ খুলে দেয়া হবে। পিঁপড়ের মতো পিলপিল করে বাইরে থেকে আসছে লোক। তাদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে সব ক'জন দোকানী। তার ওপর রয়েছে দোকান সাজানোর কাজ। কয়েকটা দোকানের সামনের কাঁচে বড় করে আঁকা হয়েছে গুহামানবের ছবি, পরনে পশুর ছাল, হাতে মুগুর। একটা দোকানের ছবি তো আরেক কাঠি বাড়া। চুল ধরে এক গুহামানবীকে টেনে নিয়ে চলেছে ভয়ানক চেহারার এক উন্মত্ত গুহামানব। প্রায় সমস্ত দোকানের সামনেটাই রঙিন কাগজের ত্রিকোণ পতাকা কেটে সাজানো হয়েছে।

গুহামুখ খোলার অনুষ্ঠান হবে ছোট পার্কটায়। তাই, রঙিন বাঘ দিয়ে সাজানো হচ্ছে গাছগুলোকে। স্ট্যাণ্ডগুলোকে নতুন করে রঙ করা হচ্ছে। অটোমেটিক স্প্রিঙ্কলার সিসটেম আছে একটা, নির্দিষ্ট সময়ে ওটার ঝাঁঝরিগুলোর মুখ খুলে যায়, বৃষ্টির মতো পানি ঝরে পড়ে পার্কের গাছপালার ওপর।

পুরনো রেলস্টেশনের কাছে আস্তানা গেড়েছে এক আইসক্রীম

ফেরিওয়ালা। ছোট ট্রাকে করে আইসক্রীম এনেছে। ভালো বিক্রি।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ম্যাকম্বারের গোলাবাড়িতে ফিরে এলো তিন গোয়েন্দা।

সেখানেও উত্তেজনা।

লম্বা, রগ বের হওয়া একজন লোক তার ওয়ার্কভ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে কাজে ব্যস্ত। যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে করতে বিড়বিড় করছে আপনমনে। 'ঠিক হচ্ছে না। মোটেই উচিত হচ্ছে না। পস্তাবে, দেখো, পস্তাবে, এই বলে দিলাম।'

কাছে এগোলো ছেলেরা। উঁকি দিয়ে দেখলো, ভ্যানের দেয়াল ঘেঁষে একটা আলমারি বসানো। একটা গ্যাসের চুলা আর ছোট একটা রেফ্রিজারেটরও রয়েছে। আর আছে একটা বিছানা, নিখুঁতভাবে বিছানো। অবাক হয়ে ছেলেরা ভাবলো, শুকনো ঢেঙা লোকটা ওই ভ্যানের মধ্যেই বাস করে নাকি?

ছেলেদের দেখে ভ্রূকুটি করলো লোকটা। 'তোমরাও ভালো বলবে না।'

চেঁচাতে শুরু করলো কে জানি।

ডাক্তার জর্জ হ্যারিসন। জানালাশূন্য নতুন বাড়িটার বাইরে দাঁড়িয়ে মুঠো পাকিয়ে শাসাচ্ছেন কাউকে। চেঁচিয়ে বললেন, 'তুমি···তুমি একটা জন্তু!'

ডাবলডোর খুলে গেল, দরজায় দেখা দিলো ম্যাকম্বার। হাতের শটগান নেড়ে কড়া গলায় বললো, 'ভাগো! যাও এখান থেকে।'

পিছিয়ে এলেন হ্যারিসন। 'জন্মের পর পরই খাঁচায় ভরা

উচিত ছিলো তোমাকে। জন্তু কোথাকার। ভেবেছো কি তুমি, অ্যাঁ? তোমার জায়গায় পাওয়া গেছে বলেই কি ওই হাড় তোমার সম্পত্তি? কেন, তোমার জায়গায় আলোও তো আছে, বাতাস আছে, রোদ আছে, ওগুলোও কি তোমার হয়ে গেল? ওই হোমিনিডটা আটকে রাখার কোনো অধিকার নেই তোমার।'

'ভালো হবে না বলে দিচ্ছি,' পাল্টা জবাব দিলো ম্যাকম্বার। 'বেআইনী ভাবে ঢুকেছো আমার জায়গায়, মাফ করে দিলাম। ভাগো এখন। দেখতে চাইলে কাল এসো। আর সবার মতো পাঁচ ডলারের টিকেট কিনে। যাও।'

গলা টিপে ধরেছে যেন কেউ, এমনভাবে ফ্যাসফ্যাস করে উঠলেন হ্যারিসন। ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে গটমট করে হাঁটতে শুরু করলেন।

হেসে ছেলেদের বললো ম্যাকম্বার, 'খুব রেগেছে।'

'উচিত হচ্ছে না!' গোঁ গোঁ করে বললো ভ্যানের মালিক।

'তোমাকে কে জিজ্ঞেস করছে?' ধমক দিলো ম্যাকম্বার। 'তোমার কাজ তুমি করো। এই যে, ছেলেরা, আসবে নাকি। দেখতে চাও, কেমন সাজিয়েছি?'

ঘুরে ভেতরে ঢুকে গেল আবার ম্যাকম্বার।

ছেলেরা গেল তার পেছনে। ভেতরে ঢুকেই হাঁ হয়ে গেল।

জাদুঘর সাজিয়েছে বটে ম্যাকম্বার। বড় বড় ছবি। হাড় আর কঙ্কালের ছবি আছে, এনলার্জ করা ফটোগ্রাফ আছে। আছে নানারকম রঙিন ছবি, আদিম পৃথিবীর প্রাকৃতিক দৃশ্য। জলাভূমি থেকে বাষ্প উঠছে, উঁচু পাহাড় থেকে ঝরে পড়ছে ঝর্না, রুক্ষ

সৈকতে ভাঙছে সাগরের ঢেউ—মাথায় ফেনার মুকুট।

ঘরের মাঝখানে অনেকগুলো টেবিল। তার ওপর সাজানো কাচের বাক্সে নানারকম প্রতিকৃতি। কোথাও বরফযুগের দৃশ্য, বরফে ঢেকে রেখেছে আমেরিকার একাংশ, কোথাও গলতে শুরু করেছে বরফ। বেরিয়ে পড়েছে গভীর হ্রদ, উঁচু উপত্যকা। একটা বাক্সে দেখা গেল, কয়েকজন উলঙ্গ রেডইনডিয়ান শীত থেকে বাঁচার জন্যে আগুনের কাছে জড়োসড়ো হয়ে আছে। আরেকটা বাক্সে আছে, বিশাল এক রোমশ ম্যামথ হাতিকে আক্রমণ করেছে গুহামানবের দল।

'ক্লাসিক হয়েছে, না?' গর্বের হাসি ফুটলো ম্যাকম্বারের মুখে। 'আসল জিনিস ওই ওদিকে।'

দরজার ঠিক উল্টো দিকে একটা মঞ্চ তৈরি হয়েছে, চারটে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। মঞ্চের পরে পাহাড়ের উলঙ্গ ঢাল, তাতে রয়েছে সেই গুহামুখটা। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত প্রবেশপথ।

সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে উঠলো তিন গোয়েন্দা। গুহামুখ দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো।

দম বন্ধ করে ফেললো কিশোর।

কেঁপে উঠলো রবিন।

পুরো কঙ্কালটা নেই, আংশিক। খুলির বেশির ভাগই রয়েছে, কালের ক্ষয়ে বাদামী, কুৎসিত। বীভৎস ভঙ্গিতে যেন তাকিয়ে রয়েছে শূন্য অক্ষিকোটর। ওপরের চোয়ালটা আছে, মাড়িতে বিকট দাঁতের সারি। গুহার মেঝে থেকে ঠেলে বেরিয়ে আছে মাটিতে গাঁথা পাঁজরের কয়েকটা হাড়। তার নিচে শ্রোণীর হাড়ের

খানিকটা, তারও নিচে পায়ের কয়েকটা হাড়। একটা হাতের হাড় লম্বা হয়ে পড়ে আছে, পাঁচ আঙুলের তিনটে উধাও, দুটো রয়েছে একেবারে গুহামুখের ধারে। যেন মৃত্যুর আগে হাত বাড়িয়ে কিছু ধরার চেষ্টা করছিলো।

গুহার ছাতে আলো ঝোলানো হয়েছে। কঙ্কালের কাছে জ্বলছে একটা কৃত্রিম অগ্নিকুণ্ড। তারও পরে যেন নিতান্ত অবহেলায় ফেলে রাখা হয়েছে কয়েকটা ন্যাভাজো কম্বল আর ইনডিয়ান কায়দায় তৈরি বেতের ঝুড়ি।

ডাক্তার হ্যারিসনের রাগের কারণ বুঝতে অসুবিধে হলো না ছেলেদের। আদিম রূপ দিতে গিয়ে পুরো ব্যাপারটাকেই হাস্যকর করে তুলেছে ম্যাকম্বার, অনেক কিছু বেমানান। চোখে আরও লাগে, কঙ্কালের চারপাশে আধুনিক বুটের অসংখ্য ছাপ। বোধহয় ইলেকট্রিশিয়ান আর টেকনিশিয়ানদের জুতোর।

'কেমন বুঝছো?' হেসে জিজ্ঞেস করলো ম্যাকম্বার। 'আচ্ছা, আরেক কাজ করলে কেমন হয়? একজোড়া মোকাসিন যদি রেখে দিই ওটার পায়ের কাছে? ভাবখানা, জুতো খুলে শুয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে?' প্রশ্নের জবাব নিজে নিজেই দিলো আবার। 'না, ভালো হবে না। বেমানান লাগবে।'

অস্ফুট শব্দ বেরোলো রবিনের মুখ থেকে।

আবার বললো ম্যাকম্বার। 'আমার মনে হয় না, এতো আগে মোকাসিন পরতো মানুষ। না?'

জবাব দিলো না ছেলেরা।

ঘুরে মঞ্চ থেকে নেমে আরেকদিকে রওনা হলো। একজায়গায়

সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো চকচকে রিঙ, তাতে খাটো শেকল দিয়ে আটকানো প্লাস্টিকের গুহামানবের প্রতিকৃতি। কিছু টি-শার্ট আছে, বুকে গুহামানবের ছবি ছাপ দেয়া।

'ওগুলো বিক্রির জন্যে,' জানালো ম্যাকম্বার। 'আজ তো নিতে পারবে না, বিক্রি শুরু হয়নি। কাল এসো। ...চলো, বেরোই।' সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দরজার দিকে এগোলো সে। চলতে চলতেই বললো, 'দরজায় তালা লাগিয়ে রাখবো। রাতে পাহারা দেবে জিপসিটা।'

'ভ্যানের কাছে যাকে দেখলাম?' কিশোর বললো।

'হ্যাঁ। ওর নাম ফ্রেনটিস, সংক্ষেপে ফ্রেনি।'

বাইরে বেরিয়ে দরজায় তালা লাগালো ম্যাকম্বার। আসলে জিপসি নয় ও। গাড়িতে বাস করে তো, জিপসিদের মতো যাযা-বর, তাই লোকে ওর নাম রেখেছে জিপসি ফ্রেনি।'

নিজের বাড়ির দিকে চলে গেল ম্যাকম্বার।

ভ্যানের দরজা খুলে উঁকি দিলো ফ্রেনি। 'আমাকে দারোয়ান রেখেছে বেতন দিয়ে, বেশ, পাহারা দেবো। কিন্তু ভালো করছে না। মানুষটা এসব পছন্দ করবে না। আমার হাড় নিয়ে এসব করলে আমি কি সহ্য করতাম?'

'কিন্তু ও জানছে কিভাবে?' বললো মুসা। 'ও তো মরা, তাই না? ওকে নিয়ে কে কি করলো না করলো তাতে ওর কিছুই যায় আসে না।'

'তাই নাকি?' রহস্যময় শোনালো জিপসির কণ্ঠ।

ছয়

ডিনারও সারতে হলো হ্যামবার্গার দিয়েই। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে আইসক্রীম কিনে খেলো তিনজনে। তারপর এসে উঠলো গোলাঘরের মাচায়। খোলা জানালা দিয়ে দেখলো সূর্যের অস্ত যাওয়া আর চাঁদের উদয়। বাতাস ঠাণ্ডা। তৃণভূমির ওপর হালকা ধোঁয়ার মতো উড়ছে কুয়াশা।

স্লীপিং ব্যাগ টেনে নিলো ছেলেরা। ঘুমিয়ে পড়লো।

অন্ধকারে দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। কে যেন ঢুকেছে গোলাঘরে। ভীত জানোয়ারের মতো গোঙাচ্ছে। উঠে বসে কান পাতলো সে।

মুহূর্তের জন্যে থামলো গোঙানি, তারপর আবার শুরু হলো।

নড়েচড়ে মুসাও উঠে বসলো। ফিসফিসিয়ে বললো, 'কে?'

জবাব না দিয়ে মাচার ফোকরের কাছে গিয়ে নিচে উঁকি দিলো কিশোর। অন্ধকার।

'এই ছেলেরা, শুনছো?' খসখসে ভাঙা কণ্ঠস্বর। 'আছো ওখানে?'

জিপসি ক্রেনি। এগোতে গিয়ে কিসের সংগে পা বেঁধে হুড়ুস করে পড়লো।

ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।

টর্চের জন্যে হাত বাড়ালো মুসা। স্লীপিং ব্যাগের পাশেই তো ছিলো। গেল কই? হাতড়ে হাতড়ে বের করে নিয়ে এসে মই বেয়ে নামলো কয়েক ধাপ। নিচের দিকে মুখ করে জ্বাললো।

একটা খালি বাক্সে পা লেগে পড়েছে ক্রেনি। উঠে তাকালো আলোর দিকে। 'তোমরাই তো?' কণ্ঠে আতংক। 'জবাব দিচ্ছো না কেন? তোমরা তো?'

'হ্যা,' জবাব দিলো কিশোর।

মই বেয়ে নেমে এলো তিনজনে।

ম্যাকম্বারের পিকআপে হেলান দিয়ে কাঁপছে জিপসি।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'মড়া…মড়াটা!' ভয়ে ভয়ে বললো ক্রেনি। 'বলেছিলাম না, পছন্দ করবে না।'

'তা হয়েছেটা কি?' মুসা জানতে চাইলো।

'ও উঠে চলে গেছে। কাল যখন গিয়ে দেখবে কঙ্কালটা নেই, আক্কেল হবে ম্যাকম্বারের। দোষ দেবে আমার। বলবে আমি সরিয়েছি। আসলে তো হেঁটে চলে গেছে। নিজের চোখে দেখলাম।'

গোলাঘরের দরজা খোলা। পাহাড়ের ঢালে নতুন বাড়িটা, মানে ম্যাকম্বারের মিউজিয়ামটার দিকে তাকালো ছেলেরা। চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে দরজা লাগানো। তালা আছে কিনা বোঝা যায় না।

'স্বপ্ন দেখেননি তো?' মোলায়েম গলায় বললো রবিন।

'না,' মাথা নাড়লো লোকটা। 'গাড়ির মধ্যে শুয়ে ছিলাম। দরজা খোলার শব্দ শুনে উঁকি দিয়ে দেখি একটা গুহামানব। গায়ে পশুর ছাল জড়ানো। চোখ দুটোও দেখেছি। ভয়ংকর। সোজা আমার দিকেই চেয়ে ছিলো। জ্বলছিলো কয়লার মতো। লম্বা লম্বা চুল। গাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেল মাঠের দিকে।'

চোখ বুজলো জিপসি, যেন চোখ বুজলেই স্মৃতি থেকে দূর হয়ে যাবে ভয়ানক দৃশ্যটা।

'চলো তো দেখি,' কিশোর বললো সঙ্গীদের।

কাছাকাছি রইলো ওরা। যেন ভয়, যে কোনো মুহূর্তে জীবন্ত হয়ে উঠে এসে সামনে দাঁড়াবে প্রাগৈতিহাসিক মানুষটা।

দেখা গেল, মিউজিয়ামের দরজা বন্ধ।

কথাবার্তার আওয়াজ শুনে দরজা খুলে বেরোলো ম্যাকম্বার। 'কি হয়েছে? এই, তোমরা এখানে কি করছো?'

'দেখছি,' জবাব দিলো কিশোর। 'আপনার দারোয়ান মাঠের ওদিকে কাকে নাকি যেতে দেখেছে।'

মিসেস জেলডা ম্যাকম্বারও উঁকি দিলো পেছনে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এগিয়ে এলো ম্যাকম্বার। 'কি হয়েছে?' ক্রেনিকে জিজ্ঞেস করলো। 'হ্যারিসন এসেছিলো নাকি?'

'গুহামানব,' বললো জিপসি, 'চলে গেছে!'

'কি পাগলের মতো বকছো?' ধমক লাগালো ম্যাকম্বার। 'জেলডা,' চেঁচিয়ে বললো, 'চাবি আনো তো।'

তালা খুলে মিউজিয়ামে ঢুকলো ম্যাকম্বার। আলো জ্বাললো।

এগিয়ে গেল গুহামুখের দিকে। পেছনে চললো ছেলেরা।

কই, ঠিকই তো আছে। আগের মতোই তাকিয়ে আছে শূন্য কোটর। বিকট নিরব হাসিতে ফেটে পড়ছে যেন একটিমাত্র চোয়াল। বুকের পাঁজর, হাত-পায়ের হাড়, সব ঠিক আছে।

জিপসির দিকে ফিরলো ম্যাকম্বার। 'কি দেখেছো? এই তো, কঙ্কাল তো এখানেই।'

'হেঁটে গেছে!' বিড়বিড় করলো ফ্রেনি। 'আমি দেখেছি। গায়ে পশুর ছাল। বড় বড় চুল। হেঁটে চলে গেল মাঠের ওপর দিয়ে।'

'তোমার মাথা! যত্তোসব!'

আলো নিভিয়ে সবাইকে নিয়ে মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এলো ম্যাকম্বার। 'যাও, ভালোমতো পাহারা দাও,' ধমক দিয়ে বললো ফ্রেনিকে। 'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখার জন্যে বেতন দিই না আমি তোমাকে।'

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো আবার জেলডা আর ম্যাক-ম্বার।

আপনমনে কি বলতে বলতে ভ্যান থেকে একটা ফোল্ডিং চেয়ার বের করলো জিপসি। শটগান হাতে পাহারায় বসলো।

গোলাঘরে ফিরে এলো তিন গোয়েন্দা।

'নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছে,' মুসা মন্তব্য করলো।

'বোকা মনে হয় লোকটাকে,' বললো রবিন।

'আমার মনে হয় না,' মাথা নাড়লো কিশোর।

'তাহলে সত্যি দেখেছে কিছু?'

'হতে পারে। হয়তো কেউ বেরিয়েছিলো মিউজিয়াম থেকে।'

'কিভাবে?' মুসার প্রশ্ন। 'দরজায় তালা ছিলো।'

'চাবি জোগাড় করে নিয়েছে,' স্লীপিং ব্যাগের ওপরে বসে খোলা জানালা দিয়ে চন্দ্রালোকিত মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। রাতের আকাশের পটভূমিকায় ওপাশের বনকে ঘন কালো দেখাচ্ছে। চাঁদের আলোয় শাদা লাগছে ঘাসের ওপরে জমা শিশিরকে, যেন শাদা চাদর। তাতে কালো কালো ছোপ এক সারিতে এগিয়ে গেছে বনের দিকে।

এর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে, ভাবলো কিশোর। হেঁটে গেছে কেউ। পায়ের চাপে ঘাস বসে গেছে, শিশির ঝরে গেছে ওখান থেকে। ফলে কালো দেখাচ্ছে।

নামতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে জিপসি ফ্রেনি। বগলে শটগান। মাঠের দিকে ফিরে কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছে।

ভ্যানে গিয়ে ঢুকলো ফ্রেনি। বেরিয়ে এলো একটা কম্বল নিয়ে। ভালো করে গায়ে জড়িয়ে আরাম করে বসলো চেয়ারে।

'ফ্রেনির বিশ্বাস, সে গুহামানব দেখেছে,' আনমনে বললো কিশোর।

বাইরে তাকালো মুসা। জ্যোৎস্নায় আলোকিত তৃণভূমির দিকে চেয়ে অস্বস্তি জাগলো মনে। 'ওকে দোষ দেয়া যায় না। বেশি ভয় পেলে জেগে থেকেও দুঃস্বপ্ন দেখে মানুষ।'

সাত

পরদিন শনিবার।

আগে ঘুম ভাঙলো কিশোরের, মাচা থেকে নেমে বেরিয়ে এলো গোলাঘরের বাইরে। উজ্জ্বল রোদে এখন আর রাতের মতো কালো দেখাচ্ছে না বন, রহস্যময় লাগছে না। তৃণভূমির ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো সে। মাটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কিন্তু একটা পায়ের ছাপও চোখে পড়লো না। কালো দাগগুলোও মুছে গেছে নতুন করে শিশির জমায়।

তিরিশ মিটারমতো এগিয়ে দেখলো একজায়গায় ঘাস বেশ পাতলা। কালো মাটি দেখা যায়। হাঁটু গেড়ে বসে ভালোমতো দেখে কেঁপে উঠলো উত্তেজনায়!

মুসা এসে যখন তার পাশে দাঁড়ালো, তখনও একইভাবে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর।

'কী?' জিজ্ঞেস করলো মুসা। 'কিছু পেলে?'

'পায়ের ছাপ। এখান দিয়ে হেঁটে গেছে কেউ, খালি পায়ে। বেশিক্ষণ হয়নি।'

ঝুঁকে মুসাও দেখলো ছাপ। সোজা হয়ে তাকালো বনের দিকে। চেহারা ফ্যাকাশে।

'খালি পায়ে!...তারমানে...জিপসি সত্যি দেখেছিলো...'

জবাব দিলো না কিশোর। উঠে হাঁটতে শুরু করলো বনের দিকে।

কিছুই না বুঝে তার পিছু নিলো মুসা।

মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটছে কিশোর। ধীরে ধীরে আবার ঘন হয়ে এসেছে ঘাস, আর একটা ছাপও চোখে পড়লো না তার। বনের কিনারে চলে এসেছে। গাছের নিচ দিয়ে চলে গেছে পায়ে চলা পথ। যেখানে ছাপ নেই। ঘন হয়ে বিছিয়ে রয়েছে পাইনের কাঁটা।

'এখানে দেখা যাবে না,' বললো কিশোর। 'আরও এগোলে...'

'এক মিনিট,' বাধা দিয়ে বললো মুসা। 'এখনি যাবে? হয়তো ঝোপের মধ্যে এখনও লুকিয়ে রয়েছে...আমি বলি কি, চলো আগে কিছু খেয়ে আসি? বেলা হলে, ভিড় বেড়ে গেলে হয়তো পাওয়াই যাবে না কিছু। শেষে না খেয়ে মরবো!'

'মুসা, এটা খুব জরুরী!' বললো কিশোর।

'কার জন্যে? চলো, আগে পেট ঠাণ্ডা করি। বনের ভেতর সারাদিনই খোঁজা যাবে, সময় তো আর চলে যাচ্ছে না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরতে হলো গোয়েন্দাপ্রধানকে।

গোলাঘরের কাছে পৌঁছুলো ওরা। রবিন বেরোলো ঘর থেকে।

নিজের ঘরের দরজা খুলে ম্যাকম্বারও বেরোলো। 'মরনিং, বয়েজ। দারুণ সকাল, তাই না? মনে হচ্ছে, মিউজিয়ামে আজ

দিনটা কাটবে ভালো।' ভ্যানের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে ডাকলো, 'অ্যাই, ফ্রেনি!'

দরজায় দেখা দিলো জিপসি। হাতে খাবারের প্লেট।

'আর গুহামানব দেখেছে, রাতে?' হেসে জিজ্ঞেস করলো ম্যাকম্বার।

'না। একটাই যথেষ্ট,' ভেতরে ঢুকে গেল ফ্রেনি।

রেগে গেল ম্যাকম্বার। 'অ্যাই, আবার ঢুকলে যে? এখনও খাওয়াই শেষ করোনি, কাজ করবে কখন?'

ঘরে ঢুকে গেল ম্যাকম্বার।

তিন গোয়েন্দা চললো শহরের দিকে।

কাফের সামনে ভিড় হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

অনেক কষ্টে গুঁতোগুঁতি করে ভেতরে ঢুকে তিনটে চেয়ার দখল করলো ছেলেরা। খাবারের অর্ডার দিলো। লোকের কোলাহল ছাপিয়ে কানে আসছে ব্যাণ্ডবাদকদের বাজনা, মহড়া দিচ্ছে। মেইন রোডে গাড়ির সারি। কয়েকটা টেলিভিশন স্টেশনের ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে পার্কের একধারে।

খাবার এলো। চামচ দিয়ে সবে মুখে তুলেছে ছেলেরা, এই সময় ঢুকলেন ডাক্তার রুডলফ। সংগে ডাক্তার রেডম্যান, ইমিউনোলজিস্ট। এদিক ওদিক চেয়ে কিশোরের ওপর চোখ পড়তেই হাসলেন রুডলফ।

'ওঁদের এখানে বসতে বললে কেমন হয়?' বন্ধুদের পরামর্শ চাইলো কিশোর।

'ভালো,' মুসা বললো। 'জিজ্ঞেস করো আগে, বসবেন কিনা।'

উঠে গিয়ে আমন্ত্রণ জানালো কিশোর। সানন্দে রাজি হলেন দুই ডাক্তার। কোনো টেবিল খালি নেই, জায়গা পেয়ে খুশিই হলেন।

'থ্যাংক ইউ,' বসতে বসতে বললেন ডাক্তার রুডলফ। 'পাগলাখানা হয়ে গেছে শহরটা। কতোদিন এরকম থাকবে কে জানে। আমার মনে হয় সারাটা গরমই এভাবে যাবে। শীত পড়লে, তারপর গিয়ে কমতে শুরু করবে লোক।' খানিকটা মাখন নিজের প্লেটে তুলে নিয়ে বললেন, 'এমনিতে সেণ্টারেই নাস্তা সারি আমরা। কিন্তু আজকাল হ্যারিসনের যা মেজাজ-মরজি। তার সাথে বসে খেয়ে আর আরাম নেই। ওর দুঃখটাও বুঝি। হাতের কাছে রয়েছে গবেষণার এমন লোভনীয় জিনিস, অথচ হাত লাগাতে পারছে না...'

'হ্যাচচো' করে উঠলেন রেডম্যান। নাকচোখ মুছে ছেলেদের দিকে চেয়ে হাসলেন, 'সর্দির জ্বালায় আর বাঁচি না।' রুডলফের দিকে ফিরে বললেন, 'যা-ই বলো, হ্যারিসন একটু বেশি বেশিই করছে।'

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে বেচারার,' নরম গলায় বললেন রুডলফ। 'প্রায় আস্ত একটা কঙ্কাল, কল্পনা করো, অথচ ছুঁতেও দেয়া হচ্ছে না ওকে...ওর জায়গায় আমি হলে আমারও একই অবস্থা হতো।'

'ডাক্তার হ্যারিসন কি করতে চাইছেন?' জিজ্ঞেস করলো রবিন। 'কার্বন ফোরটিন টেস্ট?'

'কারবন ফোরটিন দিয়ে বোধহয় কাজ হবে না এটাতে।' বুঝিয়ে

বললেন রুডলফ, 'কারবন ফোরটিন রেডিওঅ্যাকটিভ এলিমেন্ট, প্রাণীর হাড়ে থাকে। জীব বা উদ্ভিদ মারা যাওয়ার সাতান্নশত বছর পরে হাড়ে এই এলিমেন্ট কমে অর্ধেক হয়ে যায়। আরও সাতান্নশো বছর পরে তার অর্ধেক। এভাবে কমতে কমতে চল্লিশ হাজার বছর পরে হাড়ে কার্বন আর থাকেই না। তখন পরীক্ষা করেও আর কিছু বোঝা যায় না।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের। 'আপনার কি ধারণা ফসিলটার বয়েস চল্লিশ হাজারের বেশি?'

'হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বয়েস কতো, সেটা বোঝার আরও উপায় আছে, কার্বন ফোরটিন টেস্ট ছাড়াও। কিন্তু পরীক্ষার জন্যে ল্যাবরেটরিতে তো আনতে হবে...'

'ওই যে, এসে গেছে আমাদের নাস্তা,' ওয়েইট্রেসকে দেখে বলে উঠলেন রেডম্যান। 'যাক বাবা, পাওয়া গেল।'

কিছুক্ষণ নিরবতা। চুপচাপ খাচ্ছে সবাই।

'আচ্ছা,' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'ডাক্তার ক্লডিয়াস কি নিয়ে গবেষণা করতেন?'

প্রয়াত বিজ্ঞানীর কথা উঠতেই গম্ভীর হয়ে গেলেন ডাক্তার রুডলফ। 'ব্রিলিয়্যান্ট লোক ছিলো।...মস্ত ক্ষতি হয়ে গেল আমাদের।'

'হয়তো,' কথার পিঠে বললেন রেডম্যান। 'কিন্তু জিনেটিক এঞ্জিনিয়ারিঙের বিপদও আছে। এটম নিয়ে গবেষণা করে শেষে যেমন এটম বোমা বানিয়ে ফেলা হলো। জিন নিয়ে গবেষণা চালালে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তৈরি হয়ে যাওয়ার ভয় আছে।'

'ডাক্তার ক্লডিয়াস নাকি মানুষের দৈহিক উন্নতির চেষ্টা করছিলেন?' কিশোর বললো। 'লিলি বলেছে আমাদের। ঘোড়া আর শিম্পাঞ্জীকে নাকি ইতিমধ্যেই অনেক বুদ্ধিমান বানিয়ে ফেলা হয়েছে।'

'কিছুটা,' বললেন রুডলফ।

'এসব গবেষণায় শেষকালে ক্ষতিই হয় বেশি,' রেডম্যান বললেন। 'প্রকৃতি যাকে যেভাবে তৈরি করেছে, সেভাবেই থাকতে দেয়া উচিত। নইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।'

'তা ঠিক। কিন্তু ক্লডিয়াসের উন্নতিটার কথা একবার ভেবে দেখো। ক্ষতি না করে সত্যি সত্যি যদি প্রাণীদেহের উন্নতি করা যায়, কি সাংঘাতিক ব্যাপার হবে!' ছেলেদের দিকে ফিরে বললেন রুডলফ, 'বেঁচে থাকলে "গ্যাসপার পুরস্কার" পেয়ে যেতো ক্লডিয়াস। এক বছর পর পর দেয়া হয় এই পুরস্কার। দশ লাখ ডলার!'

'সেটা তো গেল,' মুসা মুখ খুললো এতোক্ষণে। 'এরপর কে পাবেন?'

শ্রাগ করলেন রুডলফ। 'কি জানি। পাকস্থলীর আলসার কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়, সেটা নিয়ে গবেষণা করছে রেডম্যান। সফল হলে সে পাবে। কিংবা মানুষের অরিজিন আবিষ্কার করতে পারলে ডাক্তার হ্যারিসন পাবে...'

'বাঁচবে অনেকদিন,' বাধা দিয়ে বললেন রেডম্যান। 'ওই যে, আসছে।'

জানালার দিকে ঘুরে তাকালো অন্যেরা। সোজা কাফের দিকে

আসছেন হ্যারিসন।

ভেতরে ঢুকতেই হাত নেড়ে তাঁকে ডাকলেন রুডলফ।

কিশোরের পাশে একটা খালি চেয়ার টেনে এনে বসলেন হ্যারিসন। 'হউফ! অনেক চেষ্টা করলাম। গভর্নরকে পাওয়া গেল বটে, কথা বলতে পারলেন না। ব্যস্ত। লাঞ্চের পর আবার রিঙ করতে বলেছেন।'

'গভর্নর এসে কি করবে? গুহা থেকে তোমাকে কঙ্কালটা বের করে এনে দেবে?' ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন রুডলফ।

'এই তো, যাচ্ছে লেগে।' ঝগড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি বললেন রেডম্যান, 'এই ইউজেন, কি মনে হয় তোমার? কাজ হবে?'

'কেন হবে না?' ভুরু নাচালেন রুডলফ। 'রাস্তা কিংবা স্কুল বানানোর দরকার হলে তখন তো লোকের জায়গা নিয়ে নেয় সরকার। ফসিলটাকে বাঁচানোর জন্যে কেন পারবে না? গভর্নরকে বলবো, এলাকাটাকে রিজার্ভ এরিয়া বলে ঘোষণা করতে। আশে-পাশে নিশ্চয় আরও ফসিল আছে। ওগুলো নষ্ট হতে দেয়া যায় না...' পার্কে ব্যাণ্ড বেজে উঠতেই থেমে গেলেন বিজ্ঞানী।

ঘড়ি দেখলেন রেডম্যান। 'দশটা বাজতে পাঁচ। অনুষ্ঠানের সময় হয়ে এলো। দেরি করে ফেলেছো, ইউজেন। ঠেকাতে পারবে না ওদের।'

আট

অনুষ্ঠান শুরু হতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল।

তিন ডাক্তার আর তিন গোয়েন্দা পার্কে পৌঁছে দেখলো, মঞ্চে উঠে বসেছে ম্যাকস্বার। পাশে তার স্ত্রী জেলডা। পরনে শাদা-কালো প্রিন্টের পোশাক, হাতে কনুই ঢাকা শাদা দস্তানা। তার পাশে বসেছে শুকনো এক লোক, গায়ে রঙচঙে জ্যাকেট। কড়া রোদের জন্যে কুঁচকে রেখেছে চোখ।

'ওয়েসলি থারগুড,' লোকটাকে দেখিয়ে নিচু কণ্ঠে তিন গোয়েন্দাকে বললেন রুডলফ। 'এখানকার মেয়র। ওষুধের দোকানটার মালিক। অনুষ্ঠানের সভাপতি। বক্তৃতা দেয়ার খুব শখ।'

কালো স্যুট আর পাদ্রীর আলখেল্লা পরা একজন এসে উঠলেন মঞ্চে, মেয়রের পাশে বসলেন। গির্জার পাদ্রী, বুঝতে অসুবিধে হলো না ছেলেদের।

একে একে শহরের আরও কয়েকজন গণ্যমান্য লোক এসে জায়গা নিলো মঞ্চে। তাদের মাঝে রয়েছে মোটেলের মালিক, সুপারমার্কেটের ম্যানেজার, এসিসটেন্ট ম্যানেজার। মঞ্চে মহিলা

উঠলো আরেকজন, এখানকার একমাত্র লিফট শপের মালিক। খাবার বিক্রি করতে করতে দেরি করে ফেললো কাফের মালিক। ছুটে আসতে দেখা গেল তাকে। তারপর এলো গ্যারেজের মালিক, সামনের সারিতে জায়গা না পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল। অগত্যা বসতে হলো পেছনের সারিতে।

'দোকানপাট সব বন্ধ করে দিয়ে এসেছে,' রুডলফ বললেন। 'সারা শহরের লোক এসে জমেছে এখানে। টাকা কামানোর ভালো মওকা পেয়েছে ম্যাকম্বার।'

পার্কের ভেতরে লোক গিজগিজ করছে। পা রাখার জায়গা নেই। এদিক ওদিক চেয়ে কিশোর দেখলো 'ক্যাম্পফায়ার গার্ল' আর 'বয়স্কাউটদের'। আরও রয়েছে 'জুনিয়র চেম্বার অভ কমার্স'-এর তরুণেরা।

পরনে কালো স্যুট, আর হ্যাটে শাদা পালক গোঁজা কয়েকজন জড়ো হয়ে আছে এক জায়গায়। সেদিকে তাকিয়ে আছে কিশোর, এই সময় পাশে এসে দাঁড়ালো মিসেস গ্যারেট। প্রশ্ন না করেই জেনে গেল কিশোর, লোকগুলো 'নাইটস অভ কলম্বাস'-এর সদস্য।

পার্কের কিনারে ট্রাক এনে দাঁড় করিয়েছে আইসক্রীমওয়ালা। চুটিয়ে ব্যবসা করছে। তারপাশে দাঁড়িয়ে আছে বেলুনওয়ালা, হাতে একগুচ্ছ গ্যাস-ভর্তি বড় বেলুন। ঘিরে রেখেছে তাকে বাচ্চারা।

যখন বোঝা গেল, 'মাননীয়' আর কেউ আসার নেই, ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়ালো মেয়র। গম্ভীর ভঙ্গিতে টোকা দিলো মাইক্রো-

ফোনে. হাত তুলে ইশারা করলো জনতাকে, নিরব হওয়ার জন্যে।

লিলিকে দেখতে পেলো কিশোর। মেয়েটার চোখে উৎকণ্ঠা, অধিকাংশ সময়েই যেমন থাকে।

'মাননীয় জনতা!' শোনা গেল মেয়রের খড়খড়ে কণ্ঠ।

সম্বোধনের কি ছিরি! —ভাবলো কিশোর।

'মাননীয় জনতা!' আবার বললো মেয়র। 'দয়া করে থামুন আপনারা, চুপ করুন। আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে। প্রথমেই অনুরোধ করবো,' পাদ্রীর দিকে ফিরে একবার মাথা ঝাঁকালো মেয়র, 'মিস্টার ডেভিড ব্যালার্ডকে। আমাদের নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্যে যেন দোয়া করেন তিনি। তারপর ব্যাণ্ড বাজাবে সেন্টারভেল হাইস্কুলের ছেলেরা, তোমরা। অনুষ্ঠান শেষে মার্চ করে এগোবে, পেছনে দল বেঁধে যাবো আমরা। মিউজিয়ম ওপন করবে আমাদের মিস লোটি হাম্বারসন।' থেমে জনতার ওপর চোখ বোলালো মেয়র। 'লোটি, তুমি কোথায়?'

'এই যে, এখানে!' ভিড়ের মধ্যে থেকে বলে উঠলো একটা পুরুষকণ্ঠ। 'লোটি, যাও।'

সরে জায়গা করে দিলো লোকেরা। এগিয়ে এসে মঞ্চে উঠলো পাতলা একটা মেয়ে, এতো রোগা, মনে হয় ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে। মাথায় সোনালি চুল। সে মঞ্চে উঠলে চেঁচিয়ে স্বাগত জানালো জনতা।

হঠাৎ চালু হয়ে গেল পার্কের অটোমেটিক স্প্রিংকলার সিসটেম, বৃষ্টির মতো জনতার ওপর ঝরে পড়তে লাগলো পানি।

শুরু হলো চেঁচামেচি, হৈ-হট্টগোল। ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি।

কিশোরের মুখে এসে লাগলো পানির ছিটা, মাথা ভিজলো, কাপড় ভিজলো। মুসার দিকে ফিরলো। তাকে অবাক করে দিয়ে হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে যেতে শুরু করলো মুসা।

পুরোটা দেখার সময় পেলো না, কিশোরের দেহও টলে উঠলো। বোঁ করে উঠলো মাথার ভেতর। মনে হলো শূন্যে ভেসে চলেছে সে, অনন্ত শূন্য, অসীম অন্ধকার।

শীত শীত লাগলো। নড়েচড়ে উঠলো কিশোর। ভেজা মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে সে। নাকে সুড়সুড়ে অনুভূতি। চোখ মেলে দেখলো, একটা ঘাসের ডগা ঢুকেছে নাকে। থেমে গেছে স্প্রিঙ্কলার, পানি ছিটানো বন্ধ।

'উঁই ইঁ...!' গুঙিয়ে উঠলো একটা পরিচিত কণ্ঠ।

ফিরে চেয়ে দেখলো কিশোর, চোখ মেলছে রবিন। মুসা পড়ে আছে, মাথা ডাক্তার হ্যারিসনের কোমরে ঠেকে আছে।

বিড়বিড়, গোঙানী, ফোঁসফাঁস, চিৎকার, নানারকম বিচিত্র শব্দ। একে একে হুঁশ ফিরছে জনতার।

ঢং ঢং করে বেজে উঠলো গির্জার ঘণ্টা, সময় জানাচ্ছে।

চট করে ঘড়ি দেখলো কিশোর। আরি! চল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে! এগারোটা বাজে! কোনো অদ্ভুত কারণে পুরো চল্লিশটি মিনিট বেহুঁশ হয়ে ছিলো পার্কের লোক!

স্প্রিঙ্কলার সিসটেম! বিড়বিড় করলো কিশোর। গোলমালটা ওটাতেই। কোনো রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে দেয়া হয়েছিলো পানিতে, বেহুঁশ করার জন্যে।

পার্কের কিনারে চেঁচিয়ে কাঁদছে কয়েকটা বাচ্চা। বেলুনওয়ালার হাতে একটা বেলুনও নেই। গুচ্ছসহ উড়ে গেছে, আকাশের অনেক ওপরে বিন্দু হয়ে গেছে এখন ওগুলো।

মাথা ঝাড়া দিয়ে মাথার ভেতরের ঘোলাটে ভাবটা দূর করার চেষ্টা করলো কিশোর। টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়ালো। রবিনকে উঠতে সাহায্য করলো।

এই সময় ছুটে আসতে দেখা গেল জিপসি ফ্রেনিকে। যেন দিনদুপুরে ভূতে ধরেছে!

'মিস্টার ম্যাকস্বার!' চেঁচিয়ে উঠলো সে। 'মিস্টার ম্যাকস্বার! সর্বনাশ হয়ে গেছে! গুহামানব! ...নেই! চলে গেছে! ...নিয়ে গেছে!'

নয়

একনাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে চললো সীমাহীন ব্যস্ততা।

শেরিফের লোকেরা ছবি তুলছে, সূত্র খুঁজছে, পাউডার ছিটিয়ে আঙুলের ছাপ নিচ্ছে। মিস্টার আর মিসেস ম্যাকম্বারের বক্তব্য রেকর্ড করছে টেলিভিশনের লোকেরা। কথা বলবে কি? রাগে, ক্ষোভে পাগল হয়ে গেছে ম্যাকম্বার। মাথার চুল ছিঁড়ছে, হাত-পা ছুঁড়ছে থেকে থেকেই।

ডাক্তার হ্যারিসনের সাক্ষাৎকার নিলো রিপোর্টাররা। ম্যাকম্বারের মতো এতোটা না হলেও, তিনিও অস্থির।

মেয়রের সাক্ষাৎকার নিলো। এমনকি জিপসি ফ্রেনিকেও ছেঁকে ধরলো টেলিভিশন আর খবরের কাগজের রিপোর্টাররা।

'কি জানি এলো!' জানালো জিপসি। 'পাহারা দিচ্ছিলাম, মিস্টার ম্যাকম্বারের কথামতো। পেছনে আওয়াজ শুনে ফিরে চাইলাম···আরিব্বাবা, দেখি কি!' কাঁধের ওপর দিয়ে কিভাবে ফিরে চেয়েছে দেখালো সে। 'দেখি কি, সাংঘাতিক এক জীব! একচোখা! এতো বড় চোখ!···আর, আর হাতির মতো দাঁত!

মানুষ না, বুঝেছেন, মানুষ হতেই পারে না। তারপর আর কিছু মনে নেই। চোখ মেলে দেখলাম, মাটিতে পড়ে আছি। মিউজিয়ামের দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে দেখি, মড়াটা নেই! গায়েব!'

'বেশি টেনে ফেলেছে, ব্যাটা,' ভিড়ের ভেতর থেকে বললো একজন।

কিন্তু মদ স্পর্শও করেনি ফ্রেনি। আর গুহামানবের কঙ্কাল গায়েব, এটাও সত্যি।

সাক্ষাৎকার নিয়ে তাড়াহুড়ো করে চলে গেল রিপোর্টাররা।

দু'জন লোককে পাহারায় রেখে শেরিফও চলে গেল।

ধীরে ধীরে কমে এলো জনতার ভিড়। যাকে দেখতে এসেছিলো, সে-ই নেই, থেকে আর কি করবে?

ডেপুটি শেরিফের সংগে কথা বলছে ম্যাকম্বার।

কাছাকাছিই ছিলো তিন গোয়েন্দা, ভিড় কমলে এগোলো মিউজিয়ামের দিকে।

'সরি, বয়েজ,' ছেলেদের দেখে বললো ডেপুটি শেরিফ। 'ভেতরে ঢুকতে পারবে না।'

ডাবলডোরের ফাঁক হয়ে থাকা পাল্লার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'চাবি ছিলো লোকটার কাছে, না? যে কঙ্কাল চুরি করেছে?'

বিস্ময় ফুটলো ডেপুটির চোখে। চট করে তাকালো একবার খোলা দরজার দিকে।

'দরজায় কোনো দাগটাগ নেই তো, তাই বলছি,' বুঝিয়ে

বললো কিশোর। 'তারমানে, তালা কিংবা কব্জা ভেঙে ঢোকেনি চোর। তাহলে দাগ থাকতোই।'

হেসে, সরে দাঁড়ালো ডেপুটি শেরিফ। 'অল রাইট, শার্লক হোমস। ভেতরে গিয়ে দেখার খুব ইচ্ছে? যাও, দেখে বলো আমাকে যা যা বোঝো।'

মিউজিয়ামের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা।

ভেতরের জিনিসপত্র যেমন ছিলো, তেমনই আছে, নাড়াচাড়া বিশেষ হয়নি। তবে সব কিছুর ওপরই কালি আর পাউডারের আস্তর। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টদের কাজ। আঙুলের ছাপ খুঁজেছে।

সারাঘরে একবার চোখ বুলিয়ে, আলোকিত গুহার ভেতরে এসে উঁকি দিলো কিশোর। এখানেও সব কিছু আগের মতোই আছে, শুধু কঙ্কালটা নেই। আর, ওটা যেখানে ছিলো সেখানকার মাটিতে গর্ত, দাগ, এলোমেলো আলগা মাটি ছড়িয়ে আছে। এখানেই এক জায়গায় একটিমাত্র পায়ের ছাপ চোখে পড়লো, বিশাল ছাপ।

'রাবারসোল জুতো পরেছিলো,' আনমনে বললো কিশোর। 'ম্যাকম্বারের ছিলো কাউবয় বুট, আর জিপসি ফ্রেনির পায়ে লেইসড-আপ, জুতোর সোল চামড়ার। চোরের পায়ে ছিলো স্নীকার জাতীয় কিছু, সোল আর গোড়ালিতে তারা তারা ছাপ।'

মাথা ঝাঁকালো ডেপুটি। 'ঠিকই বলেছো। জুতোর ছাপের ছবি তুলে নেয়া হয়েছে। কাজে লাগতে পারে ভেবে।'

পকেট থেকে ফিতে বের করে ছাপ মাপতে বসলো কিশোর। বারো ইঞ্চি। 'লম্বা লোক,' মন্তব্য করলো সে।

হাসি ফুটলো ডেপুটির মুখে। 'বাহ্, ভালোই তো, কাজ দেখাচ্ছো। গোয়েন্দা হওয়ার ইচ্ছে?'

'হয়েই আছি,' ব্যাখ্যা করার দরকার মনে করলো না কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো। 'কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। এতো কষ্ট করে এতো সব কাণ্ড করতে গেল কেন চোর? স্প্রিংকলার সিসটেমে কেমিক্যাল ঢেলে দিয়ে ঘুম পাড়ালো পুরো শহরকে...'

'ঠিকই বলেছো,' কথার মাঝে বললো ডেপুটি, 'মনে হয় কেমিক্যালই ঢেলেছে। পানির স্যাম্পল নিয়ে ল্যাবরেটরি টেস্টের জন্যে পাঠানো হয়েছে। পানির ট্যাংকও পরীক্ষা করা হবে। ওখান থেকেই স্প্রিংকলারে পানি যায়।'

'সাইন্স ফিকশন সিনেমার মতো লাগছে,' বললো কিশোর। 'পুরো শহরকে ঘুম পাড়িয়ে বিকট জন্তুর রূপ ধরে গিয়ে চড়াও হয়েছে জিপসি ফ্রেনির ওপর। তাকেও ঘুম পাড়িয়েছে কোনোভাবে। কিংবা হয়তো পার্কের রাসায়নিক বাষ্পই বাতাসে ভেসে গিয়ে লেগেছে তার নাকে। যেভাবেই হোক, বেহুঁশ হয়েছে। চোর তারপর আরামসে মিউজিয়ামে ঢুকে কঙ্কালটা তুলে নিয়ে চলে গেছে।

'এখন প্রশ্ন হলো, কেন? সাধারণ লোকের কাছে ওই হাড়ের কোনো মূল্য নেই। দর্শকদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করা যায়, তবে যেখানে যে অবস্থায় পাওয়া গেছে, সেভাবে থাকলে। ওই হাড়ের ওপর দু'জনের আগ্রহ বেশি। একজন, হ্যারিসন, অন্যজন ম্যাকম্বার। কিন্তু চুরিটা যখন হয়, তখন দু'জনেই পার্কে বেহুঁশ

হয়ে পড়েছিলো।'

'লোকের সোনা চুরি যায়, অলংকার চুরি যায়,' মুখ বাঁকালো ডেপুটি। 'কিন্তু হাড্ডি চুরি যেতে দেখলাম এই প্রথম।'

'কিশোর,' রবিন বললো, 'কি মনে হয়? চোরকে ধরতে পারবে?'

চুপ করে রইলো কিশোর। ভাবছে।

রবিনের প্রশ্নের জবাব দিলো ডেপুটি, 'অনেক চুরিরই সমাধান হয় না। রহস্য রহস্যই থেকে যায়। এটাও তেমনই কিছু হবে। পুরনো কয়েকটা হাড়ের পেছনে সময় নষ্ট করবে কে?...চলো, বেরোই।-আর কিছু দেখার নেই।'

ডেপুটির পিছু পিছু বেরিয়ে এলো ছেলেরা।

গোলাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাকম্বার। কাছেই রয়েছে জেলডা আর লিলি। লিলির হাতে চিঠিপত্রের বাণ্ডিল, আর একটা ম্যাগাজিন। এইমাত্র ডাক-এ এসেছে।

ম্যাকম্বারের হাতে একটা চিঠি। চেহারা থমথমে।

ডেপুটি আর ছেলেরা কাছে যেতেই নড়ে উঠলো ম্যাকম্বার। চিঠিটা ডেপুটির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'পড়ুন! পড়ে দেখুন!' রাগে খসখসে হয়ে গেছে কণ্ঠস্বর।

চিঠিটা হাতে নিলো ডেপুটি।

দেখার জন্যে কাছে ঘেঁষে এলো ছেলেরা।

কাগজটায় উজ্জ্বল রঙে বড় বড় অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা:

আমার কাছে আছে গুহামানব। ফেরত চাইলে ১০,০০০ ডলার লাগবে। টাকা না দিলে এমন

জায়গায় লুকিয়ে ফেলবো, কোনোদিনই আর খুঁজে পাবে না। পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকো।

'চারটে শব্দের বানান ভুল,' বিড়বিড় করলো কিশোর। 'তবে একটা ব্যাপার শিওর হওয়া গেল, টাকার জন্যে চুরি করেছে ওই হাড়।'

দশ

'দশ হাজার!' চেঁচিয়ে উঠলো লিলি।

নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করলো ম্যাকম্বার। 'হারামজাদাকে ধরতে পারলে…,' দাঁতে দাঁত চাপলো সে।

ম্যাকম্বারের কাছ থেকে খামটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলো ডেপুটি। ডাকঘরের ছাপ দেখলো। নোটটা পড়লো আরেকবার।

'ব্যাটা ইংরেজিতে কাঁচা,' বললো সে। 'বানান ভুল দেখছো না। তবে ভেবেচিন্তে কাজ করে। চিঠি পোস্ট করে দিয়েছে গত-কালই, সেন্টারভেল থেকে।' চিঠিটা পকেটে রাখলো। 'মিস্টার ম্যাকম্বার, মিউজিয়ামের চাবি কার কাছে?'

পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে দিলো ম্যাকম্বার। আরেক গোছা আছে রান্নাঘরের বোর্ডে ঝোলানো। লিলি, দেখতো গিয়ে আছে কিনা।'

বাড়ির দিকে চলে গেল লিলি। খানিক পরেই উত্তেজিতভাবে ফিরে এসে জানালো, নেই। 'চাবির রিঙে ট্যাগ লাগানো থাকে তো। চোরের বুঝতে অসুবিধে হয়নি…'

'কোন্‌টা কোন্‌ তালার চাবি,' লিলির বক্তব্য শেষ করে দিলো ডেপুটি। 'দরজা খোলা রেখেছিলেন, তাই না' মিস্টার ম্যাকম্বার। রাখবেনই তো। এশহরের সবাই রাখে। ঘরে ঢুকে চাবি বের করে আনতে কোনো অসুবিধে হয়নি চোরের।'

খুব হতাশ হয়ে ঘরে ফিরলো ম্যাকম্বার দম্পতি।

গোলাঘরের মাচায় চড়ে জানালার ধারে বসলো তিন গোয়েন্দা।

'ভাবছি,' কিশোর বললো, 'চাবি যে রান্নাঘরে থাকে, চোর সেটা কিভাবে জানলো?'

'সে-ই জানে,' বললো মুসা। 'তাছাড়া জানার দরকারই বা কি? লোকে রান্নাঘরেই চাবি রাখে বেশি। আর দরজাও যখন খোলা রাখে এখানকার লোকে…'

'সহজেই যে-কেউ ঢুকে নিয়ে যেতে পারে, এই তো? আরও একটা ব্যাপার বেশ অবাক লাগছে। গুহার মধ্যে জুতোর ছাপ।'

ভুরু কোঁচকালো রবিন। 'তাতে অবাক হওয়ার কি আছে? টেনিস শূ কিংবা রানিং শূ পরেছিলো চোর। তাতে কি?'

'গতরাতে গুহার ভেতরে কি কি ছিলো মনে আছে?' কিশোর বললো। 'ম্যাকম্বার যখন দেখাচ্ছিলো আমাদেরকে?'

মুসা আর রবিন দু'জনেই অবাক হলো।

'হাড়ের আশপাশের মাটি মাড়ানো ছিলো।' চোখ বন্ধ করে দৃশ্যটা মনে করার চেষ্টা করছে যেন কিশোর। 'তারপর, রাতে দুঃস্বপ্ন দেখলো জিপসি ফ্রেনি। বললো, গুহা থেকে বেরিয়ে গেছে গুহামানব। ম্যাকম্বার মিউজিয়ামের দরজা খুললো। গুহার ভেতরে কঙ্কালটাকে জায়গামতোই দেখলাম। তখন কি পায়ের

ছাপ ছিলো ?'

ভ্রুকুটি করলো দুই সহকারী গোয়েন্দা।

মুসা বলে উঠলো, 'না না, ছিলো না, ঠিক বলেছো। তারমানে ···তারমানে, মুছে সমান করে ফেলা হয়েছিলো।'

'আসছি।' মাচা থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে গিয়ে ম্যাকম্বারের ঘরের সামনে দাঁড়ালো কিশোর। দরজায় ধাক্কা দিলো। জেলডা খুললো। পেছনে উঁকি দিলো তার স্বামী। তাদের সংগে কি যেন কথা হলো কিশোরের। আবার মাচায় ফিরে এলো সে।

'ম্যাকম্বার বললো, সে মোছেনি,' জানালো কিশোর। 'জিপসিকে দিয়েও মোছায়নি।'

'তাহলে রাতে অন্য কেউ ঢুকে মুছে এসেছে,' বললো মুসা। 'কিভাবে? দরজায় তালা ছিলো। যদি···যদি না কঙ্কালটা··· অসম্ভব!'

'তবে, তৃণভূমিতে একটা ছাপ রেখে গেছে, যে-ই হোক,' কিশোর বললো। 'শহরে যাচ্ছি আমি। গতকাল আসার সময় একটা হবি শপ দেখেছি। কিছু জিনিস কিনে আনবো। তোমরা এখানেই থাকো, চোখ রাখো।'

আবার মই বেয়ে নেমে চলে গেল কিশোর।

ফিরে এলো আধ ঘন্টা পর। হাতে একটা প্যাকেট। 'প্লাস্টার অভ প্যারিস,' বললো সে। 'পায়ের ছাপের একটা ছাঁচ তৈরি করবো।'

গোলাঘরের ওয়ার্কবেঞ্চে বসে কাজ শুরু করলো সে। ঘরেই পাওয়া গেল রঙের একটা খালি টিন আর কয়েক টুকরো বিভিন্ন

মাপের কাঠ।

টিনে প্লাস্টার অভ প্যারিস ঢেলে তাতে পানি মিশালো কিশোর। ছোট একটা কাঠের দণ্ড দিয়ে ঘুঁটে ঘন কাইমতো করলো।

'কি প্রমাণ করবে?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'জানি না,' জবাব দিলো কিশোর। 'হয়তো কিছুই না। খালি-পায়ে একজন লোক হেঁটে গিয়েছিলো যে, আপাততঃ সেই প্রমাণ রাখবো। পরে আর ছাপটা না-ও থাকতে পারে। নষ্ট হয়ে যেতে পারে, মুছে যেতে পারে, কতো কিছুই হতে পারে।'

ছাপের ছাঁচ তুলতে চললো ওরা।

ওটার পাশে বসে কাজ করে চললো কিশোর।

'এতো কষ্ট করে কি হবে বুঝতে পারছি না,' দেখতে দেখতে বললো মুসা।

'হ্যা, কেউ তো আমাদের করতে বলেনি,' বললো রবিন। 'মক্কেল নেই। কিশোর, তোমার কি মনে হয়? ম্যাকম্বার আমাদেরকে ভাড়া করবে?'

'ওর মতো লোককে কি মক্কেল হিসেবে পেতে চায় তিন গোয়েন্দা?' পাল্টা প্রশ্ন করলো কিশোর।

'না, তা অবশ্য চায় না,' মুসা হাত নাড়লো। 'পাজি লোক। ওর বউটাও। ওই দুটোকে সহ্য করে কিভাবে লিলি, বুঝি না।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। 'হবি শপের মালিক মহিলা। লিলির মাকে চিনতো। মিসেস অ্যালজেডো নাকি খুব সুন্দরী ছিলেন। জেলডা তাঁকে দেখতে পারতো না। সেই শোধই নাকি নিচ্ছে এখন লিলির ওপর। ম্যাকম্বারও নাকি খুব বাজে ব্যবহার

করে লিলির সংগে, মহিলাই বললো। থাকাখাওয়ার টাকা পর্যন্ত নেয়। নিচ্ছে লিলির মা-বাবা মরার পর থেকেই।'

বিস্মিত হলো রবিন। 'তা কি করে হয়? তখন তো বয়েস ছিলো মাত্র আট। টাকা দিতো কোত্থেকে, কিভাবে? ব্যাংকে টাকা রেখে গিয়েছিলেন লিলির বাবা-মা?'

'হলিউডে একটা বাড়ি আছে ওদের। ওটা ম্যাকস্বারই ভাড়া দেয়, টাকাও সে-ই নেয়।'

'ও। কিন্তু হবি শপের মহিলার মুখ খোলালে কি করে? এতো কথা জানলে!'

'সহজ। জানতে চাইলো, আমরা কোথায় উঠেছি। ম্যাকস্বারের খামার কথা শুনেই গেল রেগে। আমাকে আর প্রশ্ন করতে হলো না। নিজে নিজেই অনেক কথা বললো। বললো, জিপসি ফ্রেনি লেখাপড়া জানে না। মহিলার সন্দেহ, কোনো বেআইনী কাজ করে জিপসি। সেটা জানে ম্যাকস্বার। আর তাই সুযোগ পেয়ে বিনে পয়সায় খাটিয়ে নিচ্ছে লোকটাকে।'

'তবে চিঠিটা জিপসি লেখেনি, এটুক শিওর হওয়া গেল। লিখতেই তো নাকি জানে না।'

'কাউকে দিয়ে লিখিয়ে তো নিতে পারে। তবে মনে হয় না তা করেছে। এতো চালাক না সে। আজ সকালে যা করলো, সেটাও অভিনয় বলে মনে হয়নি। সত্যি ভয় পেয়েছিলো। তাকে সন্দেহের খাতা থেকে বাদ দিচ্ছি।'

'তারমানে কেসটা নিচ্ছি আমরা, অ্যা?' মুসা বললো। 'আমাদের মক্কেল কে? লিলি?'

'মক্কেল কি থাকতেই হবে?' মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'আমাদের কাজ হলো রহস্যের কিনারা করা। অনেক রহস্য আছে এখানে। ফসিল চুরি গেল। স্প্রিংকলার সিসটেমে ওষুধ ঢেলে সারা শহরকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হলো। কোনো গোয়েন্দার আগ্রহ জাগাতে এ-ই কি যথেষ্ট নয়?'

রবিন হাসলো। 'যথেষ্টর চেয়েও বেশি।' পকেট থেকে নোটবই আর কলম বের করে লিখতে শুরু করলো। মুখে বললো, 'গুহামানব চুরি। পানিতে রহস্যময় ওষুধ। মুক্তিপণের টাকা চেয়ে চিঠি, লেখায় বানান ভুল। তবে সেটা ইচ্ছে করেও করে থাকতে পারে, বিশেষ কারও ওপর সন্দেহ ফেলার জন্যে।' মুখ তুললো হঠাৎ। 'হ্যারিসন? কঙ্কালটা হয়তো তিনিই চুরি করেছেন। তারপর মুক্তিপণের টাকা চেয়ে নোট পাঠিয়েছেন চুরির উদ্দেশ্য অন্যরকম বোঝানোর জন্যে।'

'চুরিটা যখন হয়,' মুসা মনে করিয়ে দিলো, 'তখন তিনি আমার পাশে বেহুঁশ হয়েছিলেন। আমার পরে ঘুম ভেঙেছে তাঁর। কাকে সন্দেহ করবো? পুরো শহরই তো তখন পার্কে ঘুমিয়েছিলো।'

'সবাই যে ছিলো অনুষ্ঠানে, শিওর হচ্ছি কি করে?' প্রশ্ন রাখলো কিশোর। 'এতো লোকের মাঝ থেকে কোনো একজন সহজেই সরে পড়তে পারে।'

'চুপ,' সাবধান করলো রবিন। 'লিলি আসছে।'

ফিরে দেখলো কিশোর, মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে মেয়েটা। তাড়াতাড়ি জিনিসপত্রগুলোকে আড়াল করে বসলো।

ছাঁচটা যাতে লিলির চোখে না পড়ে। হেসে বললো, 'এই যে, আপনিও এসেছেন।...আমরা চুরির ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম।'

মাথা ঝোঁকালো লিলি। এখানে অনাহুত কিনা বোঝার চেষ্টা করলো। চোখে সেই চিরন্তন অস্বস্তি। বসলো তিন গোয়েন্দার দিকে মুখ করে। 'আমি...ইয়ে...সেন্টারে যাচ্ছি। ভাবলাম, তোমরাও যদি আসো...দেখতে চাও...'

'গেলে তো ভালোই হয়,' কিশোর বললো। 'কিন্তু...'

'ইচ্ছে না হলে এসো না,' বাধা দিয়ে বললো লিলি। 'ভাবলাম, হয়তো বসে বসে বিরক্ত হচ্ছো, কিছু করার নেই...,' সামান্য উসখুস করে বললো, 'আসলে...দশ হাজার ডলার। অনেক টাকা। আংকেল ম্যাকিন্বার কয়েকজনের সংগে আলাপ করেছেন, কিভাবে জোগাড় করা যায়...'

'এতো ভাবনার কিছু নেই তার,' রবিন বললো। 'জ্যান্ত মানুষ তো আর নিয়ে গিয়ে জিম্মি করেনি।'

'না, তা করেনি। তবে খেপে গেছে আংকেল। আমার ভয় করছে। তার অনেক টাকার ক্ষতি। সবার সংগে দুর্ব্যবহার শুরু করেছে।'

'কিন্তু আপনার তো কোনো দোষ নেই,' বললো কিশোর।

'দোষটা টাকার। অনেক টাকা আসতো কঙ্কালটা দেখাতে পারলে। হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে তার একআনাও আসে না।'

'দোকানে যান নাকি?'

'যাই, যখন সেন্টারে কাজ থাকে না। বেচাকেনায় সাহায্য

করি। তবে বাধ্য হয়ে যেতে হয়, ভালো লাগে না একটুও। ভালো লাগে সেন্টারে কাজ করতে। সেখানে কেউ গালমন্দ করে না। ডাক্তার হ্যারিসন মাঝে মাঝে চেঁচায়,' হাসি ফুটলো লিলির ঠোঁটে, 'তবে তাতে মনে করার কিছু নেই। ডাক্তারের স্বভাবই ওরকম। এমনিতে খুব ভালো মানুষ। আমাকে প্রায়ই বলে আমার কলেজে ভর্তি হওয়া উচিত, স্যান ডিয়েগোতে, অথবা অন্য কোথাও।'

'ঠিকই তো। হন না কেন?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'সেখানে যেতে গাড়ি লাগে। কোথায় পাবো? জেলডা আন্টিকে একদিন বলেছিলাম, সোজা মানা করে দিয়েছে। মেয়েমানুষের বেশি পড়ে নাকি লাভ নেই, অযথা টাকা নষ্ট। তাছাড়া, আমার মায়ের পরিণতির কথাও নাকি আমার মনে রাখা উচিত।'

'মানে?' মুসার প্রশ্ন।

'মানে, কলেজে গেলেই নাকি নাক উঁচু স্বভাবের হয়ে যায় মেয়েরা। বেশি লেখাপড়া শিখে আমার মা-ও নাকি এমন হয়েছিলো। এই শহরে আর মন টেকেনি। চলে গিয়েছিলো বড় শহরে। আমার বাবাকে বিয়ে করেছিলো। আর সেজন্যেই নাকি কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে ওরা।'

'গরু নাকি!' ফস করে বলে ফেললো মুসা।

'আচ্ছা, তোমরাই বলো,' চোখ ছলছল করছে লিলির, 'এটা কোনো কথা হলো? এ-শহরে থাকলেই যে কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা যেতো না, তার কোনো গ্যারান্টি আছে? আর বলে কিনা, কলেজে গেলে উন্নাসিক হয়। আমি তো দেখেছি আমার মাকে,

কতো ভালো ছিলো। সুন্দরী ছিলো। আমার বাবাও ভালো ছিলো। খুব সুন্দর শানাই বাজাতো। শানাই খুব ভালো লাগে আমার। এখানে তো টিভি আর রেডিও ছাড়া কিছুই নেই। ভালো মিউজিক শোনার উপায় নেই।'

থেমে দম নিলো লিলি। তারপর আবার বললো, 'আমি এখান থেকে পালাতে চাই। টাকা জমাচ্ছি। সেন্টারে চাকরি করে যা পাই, তা থেকে। একশো ডলার জমিয়েছি। হলিউডে যে বাড়িটা আছে, সেটার ভাড়া তো আংকেলই নিয়ে যায়, আমার থাকা-খাওয়ার খরচ।'

'কতো ভাড়া আসে, জিজ্ঞেস করেছেন কখনও?' কিশোর বললো। 'সব টাকা লাগে আপনার খাওয়ায়? আপনি এখান থেকে চলে গেলে তো বাড়িভাড়ার একটা কানাকড়িও পাবে না আপনার আংকেল।'

অবাক মনে হলো লিলিকে। 'কিন্তু আমি তো সেটা করতে পারবো না। ভীষণ রেগে যাবে ওরা। আমাকে আর জায়গা দেবে না।'

'কি হবে তাতে?' মুসা বললো। 'বাড়ি ভাড়ার টাকা দিয়েই তো আপনি চলতে পারবেন।'

'বলছি বটে পালাবো, কিন্তু যাবো কোথায়, সেটাও ভাবি। যাওয়ার কোনো জায়গা নেই আমার।'

'কেন, হলিউডে চলে যাবেন,' পরামর্শ দিলো রবিন। 'আপনার নিজের বাড়িতে।'

'তা কি করে হয়? ওটাতে লোক থাকে। তারা যাবে কোথায়?'

উঠে দাঁড়ালো লিলি। 'ওখানে যেতে পারবো না। আগে টাকা জমাই, তারপর দেখি কোথায় যাওয়া যায়।...তা তোমরা আসবে নাকি? যাবে সেন্টারে?'

'আপনি যান,' বললো কিশোর। 'গোলাঘরে যেতে হবে আমাদের। কয়েকটা জিনিস নিয়ে, তারপর আসছি।'

লিলিকে চলে যেতে দেখলো ছেলেরা।

'পালানোর সাহস আছে ওর?' মুসা বললো।

'কি জানি,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'এখানে থাকতেও চায় না। আবার অচেনা জায়গায় যেতেও ভয় পায়।'

ছাঁচ তোলার কাজটা শেষ করতে বসলো।

তৈরি হয়ে গেল ডান পায়ের চমৎকার একটা প্রতিকৃতি।

'দারুণ হয়েছে!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

'হুম্‌ম্‌,' দেখতে দেখতে আপনমনে মাথা দোলালো কিশোর। 'গুহামানবের পায়ে গণ্ডগোল ছিলো।...দেখো, এই যে বুড়ো আঙুল। তারপর ফাঁক। তার পরে বাকি তিনটে আঙুল। মাঝের দ্বিতীয় আঙুলটা গেল কই? বুড়ো আঙুল আর বাকি তিনটের চাপে পড়ে ওপরে উঠে গিয়েছে। ছাপ পড়েনি মাটিতে।'

'গুহামানবের!' অবাক হয়েছে রবিন।

'ঠিক মানাচ্ছে না, না? আঙুলের এরকম গোলমাল শুধু তখনই হয়, যখন জুতো ঠিকমতো পায়ে লাগে না।'

ফিতে বের করে ছাঁচটা মাপলো কিশোর। নয় ইঞ্চি।

'মিউজিয়ামে চোর যে ছাপ রেখে গেছে, সেটা অনেক বড়,' বললো সে। 'এটা ছোট।'

ঢোক গিললো মুসা। 'তারমানে বলতে চাইছো, এটা গুহা-মানবের?'

'গুহামানব মরা,' বললো কিশোর। 'অনেক বছর আগে মরেছে। আর মরা মানুষ কখনও উঠে হাঁটে না। এই ছাপটা আর যারই হোক, মরা মানুষের নয়।'

এগারো

আস্তাবলে পাওয়া গেল লিলিকে, ঘোড়ার যত্ন নিচ্ছে। বিল উই-লিয়ামও আছে সেখানে, একটা স্টলে হেলান দিয়ে কাজ দেখছে।

'চুরির খবর শুনলাম,' তিন গোয়েন্দাকে দেখে বললো বিল। আমার কপাল খারাপ, এমন একটা অনুষ্ঠান মিস করেছি। সর্দিতে কাহিল হয়ে শুয়েছিলাম বাড়িতে।'

'তাই নাকি!' বললো কিশোর। 'এখন কেমন?'

'অনেকটা ভালো। এসব অসুখ বেশিক্ষণ থাকে না।'

'পার্কে যা-তা কাণ্ড হয়ে গেল,' মুসা বললো। 'পৌনে এক ঘন্টা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলো সবাই।'

'ঘুম পেয়েছিলো, কি আর করবে?' রসিকতার সুরে বললো বিল। লিলির দিকে চেয়ে বললো, 'বন্ধুদের সংগে কথা বলো। আমি যাই।' নিরবে চলে গেল সে, রবারসোল জুতোয় শব্দ হলো না।

রানিং শূ পরেছে,' নিচু গলায় বললো মুসা।

অনেকেই পরে,' লিলি বললো।

ঘোড়ার গা ডলা শেষ করলো সে। আস্তাবল থেকে বেরিয়ে ল্যাবরেটরির দিকে রওনা হলো।

সংগে চললো তিন গোয়েন্দা।

ডাক্তার ক্লডিয়াসের ল্যাবরেটরিতে ঢুকলো ওরা। লিলিকে দেখে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো শিম্পাঞ্জী দুটো, খাঁচার ভেতরে লাফালাফি শুরু করলো।

'আরে থাম, থাম,' হাসতে হাসতে বললো লিলি। খুলে দিলো খাঁচার দরজা। দুই লাফে বেরিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলো শিম্পাঞ্জীদুটো।

'হয় ওদের মানুষ হওয়া উচিত ছিলো, কিংবা আপনার শিম্পাঞ্জী,' হেসে বললো মুসা।

'খুব ভালো ওরা, তাই না? কি মিষ্টি। আমাকে খুব ভালোবাসে। ডাক্তার ক্লডিয়াসকে আরও ভালোবাসতো।'

'না বাসলেই বরং অবাক হতাম,' রবিন বললো।

কিশোর কিছুই বলছে না। মরহুম বিজ্ঞানীর ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়ে টেবিলের জিনিসপত্র দেখছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকটা চোখে পড়লো তার। খুলে, পাতা ওল্টাতে লাগলো। এক জায়গায় এসে আটকে গেল দৃষ্টি।

একটা পাতায় ছাপা রয়েছে, 'এপ্রিল ২৮'। পরের পৃষ্ঠাটায় 'মে ১৯'। মাঝখানের এতোগুলো পাতা গায়েব।

'বিশটা পৃষ্ঠা নেই,' বিড়বিড় করলো কিশোর। 'ইনটারেসটিং! আচ্ছা, মে-র শুরুতে তো মারা গিয়েছিলেন ডাক্তার ক্লডিয়াস?'

আরেকদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে লিলি। 'ইয়ে...মে-রই

কোনো একদিন,' জোর নেই কণ্ঠে।

'পাতাগুলো ছিঁড়লো কেন?'

'আ-আমি জানি না,' একটা শিম্পাঞ্জীকে বাহুতে নিয়ে দোলাচ্ছে লিলি, মানুষের বাচ্চাকে যেভাবে দোলায় মা।

রবিন আর মুসা চেয়ে আছে তার দিকে। সতর্ক, কৌতূহলী।

'সেদিন রকি বীচে ডাক্তার ক্লডিয়াসের সংগে কেন গিয়েছিলেন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'তার সংগে এই ছেঁড়া পাতার কোনো সম্পর্ক আছে?'

'না।...আমার মনে হয় না।'

'শিম্পাঞ্জীর কোনো ব্যাপার?'

'হতে পারে। তাঁর কাজকর্মের ব্যাপারে তেমন কিছু জানতাম না, শুধু জানোয়ারগুলোকে দেখাশোনা করতাম। সংগে গিয়েছিলাম, কারণ...কারণ তিনি ভালো বোধ করছিলেন না।'

'হারবারভিউ লেনের কোথায় যেতে চাইছিলেন? কে থাকে ওখানে?'

লিলির চোখে অস্বস্তি বাড়লো। কেশে গলা পরিষ্কারের চেষ্টা করলো অযথা। দু'গালে অশ্রু ধারা।

'আজ আমার ভাল্লাগছে না,' অবশেষে বললো সে। 'কিছু মনে করো না। তোমরা আজ যাও।'

ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এলো ছেলেরা। ওয়ার্করুমে দেখা হলো মিসেস গ্যারেটের সংগে। ছাপার পোশাকের ওপরে দোমড়ানো একটা অ্যাপ্রন পরেছে। মাথায় উইগ—কালো চুলের মাঝে শাদা একটা রেখা।

'সব ঠিক আছে তো?' হেসে জিজ্ঞেস করলো মহিলা।

কিশোরের মনে হলো, বেশি কথা বলে, এবং বেশি মিশুক যেহেতু, নিশ্চয় মূল্যবান তথ্য জানাতে পারবে মিসেস গ্যারেট। চেহারাটাকে বিষণ্ণ করে তুললো চোখের পলকে। 'লিলির মন খারাপ করে দিয়ে এসেছি। ডাক্তার ক্লডিয়াসের কথা তুলেছিলাম। কাঁদতে আরম্ভ করলো।'

আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ালো মহিলা। 'ডাক্তারকে খুব ভালোবাসতো। আমরা সবাই বাসতাম। ভালো লোক ছিলো।'

'লস অ্যাঞ্জেলসে সেদিন কেন গিয়েছিলো, জানেন? মারা গেল সেদিন। কোনো আত্মীয় থাকে ওখানে?'

'জানি না। কথা খুব কম বলতো তো, কিছু জানার উপায় ছিলো না। আমার মনে হয়, জানোয়ারগুলোর ব্যাপারে কোনো কিছু। যা কাণ্ড করতো না ওগুলোকে নিয়ে। সন্তানের মতো ভালোবাসতো। কোনোটা মরে গেলে দিনের পর দিন শোক করতো।'

'কটা মরেছে?'

'অনেকগুলো। লাশগুলো কেটেচিরে দেখতো ডাক্তার। জ্যান্ত জানোয়ারের অপারেশনও করতো। ওগুলো যখন ঘুমিয়ে থাকতো, প্রায়ই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো।' কি যেন ভাবলো মিসেস গ্যারেট। 'ওগুলো তখন ঘুমাতোও কেন জানি খুব বেশি। এখন অনেক সজীব হয়েছে।'

ঝনঝন করে কি যেন ভাঙলো হলরুমে।

'হায়, হায়, কি ভাঙলো!' দরজার কাছে ছুটে গেল মহিলা। 'আরে, বিলি। হাতে জোর নাই?'

বেরিয়ে এলো বিল উইলিয়ামস। এক হাতে ঝাড়ু, আরেক হাতে ভাঙা শাদা একটা ডিশ জাতীয় পাত্র। 'তেমন কিছু নষ্ট করিনি। খালিই ছিলো।'

'খালি ছিলো বলে দাম নেই নাকি? আরও হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করবে।'

ছেলেদের দিকে আলতো মাথা নুইয়ে হাঁটতে শুরু করলো বিল।

'মার্কেট থেকে ওগুলো কখন আনবে?' পেছন থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো মিসেস গ্যারেট।

'আরে, দূর! আমি এখন পারবো না!' চেঁচিয়েই জবাব দিলো বিল। 'এতো ক্যাট ক্যাট করো কেন?' চলে গেল দরজার বাইরে।

নাকমুখ কুঁচকে বিচিত্র শব্দ করলো মহিলা।

বাইরে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা।

ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা আছে একটা পুরনো দুই-দরজার সিডান গাড়ি। তাতে উঠছে বিল। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে অপেক্ষা করলো। ছেলেরা কাছে এলে বললো, 'বুড়ি হলে মেয়েমানুষগুলো একেকটা শয়তান হয়ে যায়,' বাঁকা হাসলো সে। ছেলেদেরকে লিফট দিতে চাইলো।

'থ্যাংকস,' বললো কিশোর। 'ওদিকে যেতে চাই না।' দেখলো, পেছনের সিটে গাদাগাদি হয়ে আছে ম্যাগাজিন, কাদা-মাখা বুটজুতো, দোমড়ানো একটা কাগজের বাক্স, একটা স্কুবা মাস্ক, আর একটা ওয়েট স্যুট।

মাথা ঝাঁকিয়ে, গাড়ি নিয়ে চলে গেল বিল।

'বড় বেশি আজেবাজে কথা বলে,' তিক্ত কণ্ঠে বললো মুসা।

'ওর মা বুড়ো হয়নি?'

'হুঁ!' মুসার কথা কিশোরের কানে গেছে বলে মনে হলো না। খানিক আগে মিসেস গ্যারেটের সংগে যা যা কথা হয়েছে, সেগুলো নিয়ে ভাবছে।

'ডাক্তার রুডিয়াস এতোটা চাপা স্বভাবের না হলে ভালো হতো,' অবশেষে বললো সে। 'রকি বীচে কেন গিয়েছিলেন, মিসেস গ্যারেটকে একথা বললে, আমরা জানতে পারতাম। পেটে কথা থাকে না মহিলার। ওদিকে লিলি হয়েছে উল্টো। কথাই বের করা যায় না তার কাছ থেকে। আমি শিওর, লিলি অনেক মিছে কথা বলেছে। কেন? কি গোপন করছে?'

'গুহামানব সম্পর্কে কিছু?' রবিন বললো।

'কে জানে?'

গোলাঘরের কাছে পৌঁছে জেলডাকে পেছনের বারান্দায় দেখলো কিশোর।

গোলাঘরের দিকে চললো ওরা।

ওখানে পৌঁছে জেলডাকে দেখা গেল তার বাড়ির পেছনের বারান্দায়।

ছেলেদের দেখেই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'লিলিকে দেখেছো?'

'দেখেছি,' জবাব দিলো রবিন। 'সেন্টারে।'

'হুঁম। হতচ্ছাড়া জানোয়ারগুলোর কাছে। সুযোগ দিলে এঘরেই এনে তুলতো ওগুলোকে। সাফ বলে দিয়েছি, ভাড়া দিতে না পারলে এখানে কারও জায়গা হবে না।'

'তা-তো নিশ্চয়ই,' মোলায়েম স্বরে বললো কিশোর। 'আচ্ছা, ম্যাডাম, স্প্রিংকলার সিসটেমের পানি যে নিয়ে গেছে পরীক্ষা করতে, করেছে? কোনো খবর এসেছে? কিছু পাওয়া গেছে?'

'পাওয়া যায়নি। ট্যাংকের পানিতেও না, স্প্রিংকলারেও না। শেরিফ তো অবাক। বললো, 'সারা শহর নাকি পাইকারী সম্মোহনের শিকার হয়েছিলো।'

বারো

জেলডা ম্যাকস্বার ভেতরে চলে যেতেই চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়লো কিশোর। 'সাইকাস্রী সম্মোহনে আমার বিশ্বাস নেই। মরহুম বিজ্ঞানীও অস্থির করে তুলেছে আমাকে।'

'মরা মানুষ অস্থির করেই,' মুসা বললো।

'না, সেকথা বলছি না আমি। আমি ভাবছি ছেঁড়া পাতাগুলোর কথা। নিশ্চয় মূল্যবান কিছু ছিলো ওগুলোতে। ইস্, ডাক্তার ক্লডিয়াসের অফিসের কাগজপত্র, আর কয়েকটা ফাইল যদি পড়তে পারতাম!'

'পারবে না,' রবিন নিরাশ করলো। 'মূল্যবান কাগজপত্র আলমারিতে তালা দিয়ে রাখাই স্বাভাবিক।'

'হুঁ,' বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা দোলালো কিশোর। তারপর উজ্জ্বল হলো চোখের তারা। 'বিল কিন্তু আজ পার্কে যায়নি, সকালে। ওই সময়ে শহরের আর কে কে অনুপস্থিত ছিলো?'

রবিনের কপালে ভাঁজ পড়লো। 'আমাদের চেনা সবাইই তো ছিলো···শুধু, বিল, আর জিপসি ফ্রেনি বাদে।'

'আচ্ছা, জিপসিকে বাদ দিচ্ছি কেন আমরা?' মুসা বললো। 'ওর কথা ভাবছি না কেন? হয়তো বোকা সেজে থাকা তার একটা ভান।'

'না,' মাথা নাড়লো রবিন। 'অনেক বছর ধরে আছে সে এখানে। ফন্দিবাজ হলে অনেক আগেই লোকের চোখে পড়তো।'

'আমারও তাই মনে হয়,' কিশোর একমত হলো। 'গতরাতে কাউকে সত্যি সত্যি দেখেছে সে। তার প্রমাণও পেয়েছি আমরা। পায়ের ছাপ। লোকটা কোথায় গেল, দেখা হলো না কিন্তু।'

মাঠের ওপারে বনের দিকে তাকালো মুসা। 'চলো না, গিয়ে দেখি এখন।'

ছাপটার কাছে এলো ওরা প্রথমে। তারপর সোজা হাঁটতে লাগলো। বনের মধ্যে এক জায়গায় খোলা মাটি পাওয়া গেল, নরম। পায়ের ছাপও মিললো সেখানে।

সাবধানে এগিয়ে চলেছে তিন গোয়েন্দা। ভয়, যেন গাছের আড়ালে ঘাপটি মেরে আছে বিপদ।

অবশেষে পাতলা হয়ে এলো বন। বনের কিনারে এসে দাঁড়ালো ওরা। সামনে আবার তৃণভূমি আর বৈঁচিঝোপ। পুরনো একটা ভাঙা বিল্ডিং দেখা গেল। দেয়ালের লাল ইটের পাঁজর বেরিয়ে পড়েছে এখানে সেখানে, কোথাও কোথাও ধসে পড়েছে। লাল টালির ছাতের বেশির ভাগটাই ধসা। থামের মাথা বেরিয়ে আছে।

'গির্জা ছিলো,' অনুমান করলো রবিন।

জবাব দিলো না কেউ।

বাড়িটার দিকে এগোলো ওরা।

বিশাল কাঠের দরজার একটা পাল্লা কব্জা খুলে পড়ে গেছে, আরেকটা আছে জায়গামতো। পড়ে থাকা পাল্লাটা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো ওরা।

'গুহামানব গতরাতে এখানেই ঢুকেছিলো?' প্রশ্ন করলো মুসা।

'কি করে বলি,' চিহ্ন খুঁজছে কিশোর। 'কোনো চিহ্নটিহ্ন তো দেখছি না।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে গির্জার সামনের দিকে এগোলো রবিন। একধারে খানিকটা উঁচু জায়গা, দুটো সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠতে হয়।

'মঞ্চ,' বললো রবিন। 'দেখো, ওই যে আরেকটা দরজা। ঘর আছে। ভেস্ট্রি হতে পারে, পাদ্রীরা তাদের আলখেল্লা বোধহয় ওখানেই রাখতো।'

দাঁড়িয়ে আছে ছেলেরা। মাত্র দুটো সিঁড়ি ডিঙানোর সাহস নেই যেন। নিরবে চেয়ে আছে দরজাটার দিকে। কি আছে ওপাশে?

একটা শব্দ শোনা গেল। হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে গেল ওদের।

দরজার ওপাশে কে জানি নড়ছে!

মড়মড়, খসখস আওয়াজ। ঝমঝম করে কি যেন পড়লো।

তারপর আবার নিরবতা।

এক পা পিছিয়ে গেল মুসা। বিপদ দেখলেই ঘুরে দেবে দৌড়।

সাহস দেখালো রবিন। পা বাড়ালো সিঁড়িতে ওঠার জন্যে। খপ করে তার হাত চেপে ধরলো মুসা। 'যেও না!' ফিসফিস

করে বললো। 'হয়তো···ওটাই···

কোন্‌টা, বলার দরকার হলো না। বুঝলো রবিন। গুহামানবের কথা বলছে মুসা। তার ধারণা, গুহা থেকে জ্যান্ত হয়ে উঠে চলে এসেছে ওটা।

'অসম্ভব!' নিচু গলায় বললো কিশোর। এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। উঠলো উঁচু জায়গাটায়। হাত রাখলো দরজার নবে।

শিউরে উঠলো হঠাৎ। সে ঘোরানোর আগেই ঘুরতে শুরু করেছে দরজার নব। গুঙিয়ে উঠলো মরচে ধরা কব্জা, খুলতে শুরু করলো পাল্লা!

তেরো

'আরে, তোমরা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ডাক্তার রেডম্যান। 'খুব চমকে দিয়েছো, যা হোক। এখানে কি করছো?'

কাঁপছে তখনও কিশোর। জোর করে হাসলো। 'এই একটু ঘুরে দেখতে এসেছি।'

ঠিকই আন্দাজ করেছে রবিন। ওটা ভেস্ট্রিরুমই। তারপরে গির্জার হল। সব শেষে আরেকটা ছোট ঘরের পরে বেরোনোর দরজা। খোলা। দেখা যাচ্ছে মঞ্চ থেকেই।

'আসা উচিত হয়নি,' বললেন ডাক্তার। 'এটা প্রাইভেট প্রোপার্টি। ওয়ারনারদের সম্পত্তি। পাহাড়ের ওদিকে বিরাট বাড়ি আছে ওদের। অনুমতি নিয়ে আমি এসেছি। বাইরের কারো আনাগোনা এখানে পছন্দ করে না ওরা।' সিঁড়ির ওপর বসলেন তিনি। 'তবে, তোমাদের দোষ দেয়া যায় না। এ-বয়সে আমিও ওরকম ছোঁক ছোঁক করতাম। পুরনো বাড়ির কতো ভাঁড়ার আর চিলেকোঠায় যে চুরি করে ঢুকেছি।'

জোরে হাঁচি দিলেন ডাক্তার। নাক টানলেন। পকেট থেকে

রুমাল বের করে নাক-চোখ মুছে বললেন, 'ইস্, হতচ্ছাড়া এই সর্দি আর গেল না। অ্যালার্জি আছে আমার। আর এটাই আমাকে ইমিউনিটির ব্যাপারে আগ্রহী করেছে।' উঠে দাঁড়ালেন। 'যাওয়া দরকার। শরীরটা ভালো লাগছে না। শহরে যাবে, নাকি আরও ঘোরাঘুরি করবে? তবে করাটা উচিত হবে না। বুড়ো ওয়ারনার পছন্দ করে না এসব। একটা শটগান আছে, দেখলেই ওটা নিয়ে তাড়া করে লোককে। বিশেষ করে তোমাদের বয়েসী ছেলেদের।'

'শটগান আরও একজনের আছে,' হেসে বললো কিশোর। 'জনাব কিংসলে ম্যাকম্বারের।'

'চলো, ফিরেই যাই,' মুসা বললো।

ডাক্তার রেডম্যানের সংগে বেরিয়ে এলো ওরা।

'অ্যালার্জির ব্যাপারে আগ্রহ?' বুনোপথ ধরে চলতে চলতে বললো কিশোর। 'কিন্তু আপনি তো ইমিউনোলজিস্ট। অ্যালার্জি বিশেষজ্ঞদের অ্যালার্জিস্ট বলে না? তাই তো জানি।'

'ঠিকই জানো। তবে একটার সংগে আরেকটার যোগাযোগ আছে। ইমিউনিটিও একধরনের অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন।'

'তাই নাকি?' রবিন বললো।

মাথা ঝোঁকালেন ডাক্তার। 'আমাদের শরীর নিজেকে বাঁচানোর জন্যে নানারকম উপায় করে রেখেছে। প্রয়োজনে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে। ওই অ্যান্টিবডি ক্ষতিকারক ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়া নষ্ট করে দেয়। ধরো, তোমার হাম হলো। তখন তোমার শরীরের ভেতরে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে ওই রোগের

জীবাণুর সংগে লড়াই করার জন্যে। রোগ সেরে যাওয়ার পরেও ওই অ্যান্টিবডির খানিকটা তোমার শরীরে থেকেই যাবে। ফলে সহজে আর হাম হবে না।

'কিংবা ধরো, বিশেষ কোনো কিছুতে তোমার অ্যালার্জি আছে। এই, কোনোধরনের ফুলের রেণুতে। ওসবের সংস্পর্শে এলেই প্রতিক্রিয়া হবে তোমার শরীরে, অ্যান্টিবডি তৈরি শুরু হবে। যেহেতু কোনো জীবাণু পাবে না নষ্ট করার মতো, রিঅ্যাকশন করে বসবে তখন ওই অ্যান্টিবডি। একধরনের রাসায়নিক দ্রব্য বেরোতে থাকবে, যাকে বলে হিসটামিন। হয়তো তখন নাক ফুলে যাবে তোমার, চোখ দিয়ে পানি পড়বে।

'শরীরের এই ইমিউন সিসটেমই অনেক রকম ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখে আমাদের। তবে কখনও কখনও এই সিসটেম শারীরিক ক্ষমতার আওতার বাইরে চলে যায়। আর তখনই দেখা দেয় বিপদ। নানারকম মারাত্মক অসুখ দেখা দেয়।

'যেমন, গেঁটে বাত। সর্দি-কাশি। আজকাল বলা হয়ে থাকে, ক্যানসার নাকি ইমিউন রিঅ্যাকশনের জন্যেই হয়ে থাকে। তবে সেটার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। ···এমনকি, ইমিউনিটিই মানুষের মাঝে অপরাধ প্রবণতা জাগিয়ে তোলার জন্যে দায়ী।'

'অপরাধপ্রবণতা?' প্রতিধ্বনি করলো যেন মুসা।

'অনেক সময় ভয়ের প্রতিক্রিয়া থেকে জন্ম নেয় অপরাধ,' ব্যাখ্যা করলেন ডাক্তার। 'ধরো, কোনো বিপজ্জনক জায়গায় বেড়ে উঠছে একজন মানুষ। সারাক্ষণ ভীতির মাঝে কাটাতে হয় তাকে। ফলে শরীরে গড়ে ওঠে ভয়কে রোধ করার বিশেষ

ব্যবস্থা। স্বভাব বদলে যায় মানুষটার। অনেকটা বুনো জানোয়ারের মতো হয়ে ওঠে। নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে আক্রান্ত হওয়ার আগেই আক্রমণ করে বসে।' গম্ভীর হয়ে গেছেন রেডম্যান। 'শরীরের এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা আমাদের জন্যে খুবই দরকারী, আবার মস্ত বড় হুমকি। ল্যাবরেটরিতে ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা চালাচ্ছি আমি। ওগুলোর ইমিউন সিসটেম নষ্ট করে দিয়ে ভরে রেখেছি জীবাণু-নিরোধক কাঁচের বাক্সে। দেখেছি, ইমিউন সিসটেম নিয়ে অপ্রতিরোধ্য অবস্থায় যেগুলো থাকে, সিসটেম ছাড়াগুলো তার চেয়ে বেশি বাঁচে। ইমিউন থেকে জন্ম নেয় যেসব রোগ, তেমন অনেক রোগ স্পর্শ করে না ওগুলোকে।

'কল্পনা করো এখন, ইমিউন ছাড়া, কিংবা ভিন্ন ইমিউন সংযোজিত মানুষের কথা। কতো মারাত্মক রোগ থেকে বেঁচে যাবে। যদি সফল হতে পারি!' মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'আর কি সব ছাইপাঁশ নিয়ে আছে অন্য ডাক্তাররা। ক্লডিয়াসের কথাই ধরো। কি করতে চেয়েছে? না, বুদ্ধিমত্তার পরিবর্তন ঘটাবে। তাতে কি কচুটা হবে? আর হ্যারিসনটা আছে পুরনো হাড়গোড় নিয়ে। কখন কোনটার জন্ম হয়েছে, জানলে কি পৃথিবীর রূপ বদলে যাবে? যত্তোসব, এনার্জি লস।'

বনের বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা।

ছেলেদের সংগে হাত মিলিয়ে, বিদায় নিয়ে সেন্টারের দিকে রওনা হলেন রেডম্যান।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ নিরবতার পর মুসা বললো, 'আমি শিওর, এবারকার গ্যাসপার পুরস্কার ডাক্তার রেডম্যানই পাবেন।'

আনমনে মাথা ঝোঁকালো শুধু কিশোর।

খাওয়ার জন্যে কাফেতে চললো ওরা।

শহরের ভিড় অনেক কমে গেছে। কাফে প্রায় খালি। আরাম করে বসে খেতে খেতে আলোচনা চালালো ছেলেরা।

'জটিল এক রহস্য,' মুখ বাঁকিয়ে বললো মুসা। 'কি কাণ্ড রে বাবা। সারা শহর একসাথে ঘুমিয়ে পড়া। ওদিকে গুহা থেকে গায়েব হয়ে গেল গুহামানব।'

'পায়ের ছাপের ছাঁচটা,' কিশোর বললো, 'ডাক্তার হ্যারিসনকে দেখালে কেমন হয়?'

'কি হবে তাতে?' প্রশ্ন রাখলো রবিন। 'গুহামানব যে নয়, এটা তো আমরাই জানি।'

'তা জানি। তবে, কি থেকে কি বেরোয় কে জানে।'

'হ্যাঁ, চেষ্টা করতে দোষ নেই।'

খাওয়া শেষ করে গোলাঘরে ফিরে এলো ছেলেরা। ছাঁচটা নিয়ে চললো গ্যাসপার সেন্টারে।

ওয়ার্কিরুমেই পাওয়া গেল ডাক্তার হ্যারিসনকে। কাগজ আর বইপত্র বোঝাই ডেস্কের সামনে বসে আছেন। ছেলেদের দেখে মুখ তুলে তাকালেন। ওদের ভয় ছিলো, দেখেই ফেটে পড়বেন। সেসব কিছু করলেন না। হাতের বইটা বন্ধ করে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার?'

'কিছু পরামর্শ চাই, স্যার,' খুব বিনীতভাবে বললো কিশোর, 'কিংবা বলতে পারেন, কিছু তথ্য। রাতে মিস্টার ম্যাকস্বাবের গোলাঘরের মাচায় থাকি আমরা। গতরাতে একটা কাণ্ড ঘটেছে, সেখানে থাকায় শুনতে পেয়েছি।'

জিপসি যে গুহামানব দেখেছে, সেই গল্প বললো কিশোর। শেষে পায়ের প্রতিকৃতিটা বের করে দিলো।

একনজর দেখেই ওটা টেবিলে রেখে হাসলেন ডাক্তার। 'প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ছাপ পেয়েছো ভেবে খুশি হলে নিরাশ হতে হবে। বেশিদিন খালি পায়ে হাঁটলে পায়ের পাতা ছড়িয়ে যায়, আর এটাতে ছড়ানো তো দূরের কথা, একটা আঙুলই অস্পষ্ট। তারমানে খুব টাইট জুতো পায়ে দেয়।'

'কিন্তু জিপসি বললো একজন গুহামানবকে দেখেছে,' রবিন বললো। 'লম্বা লম্বা চুল। পরনে পশুর ছাল।'

শব্দ করে হাসলেন এবার হ্যারিসন। 'গুহামানবেরা যে পশুর ছাল পরতো, এটা শিশুরা জানে? জিপসি কি দেখেছে কে জানে, তবে গুহামানব হতেই পারে না। পায়ের ছাপই সেটার প্রমাণ। এটা কোনো হোমিনিডের পায়ের ছাপ নয়। অনেক বড়।'

'বড়?' অবাক হলো মুসা। 'কিন্তু মাত্র নয় ইঞ্চি।'

'তারমানে ওই পায়ের মালিকের উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন-চার ইঞ্চি। গুহায় যে কঙ্কালটা ছিলো, তার চেয়ে অনেক বড়।... দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। আফ্রিকায় একটা কঙ্কাল পেয়েছি আমি। হোমিনিড। প্রায় বিশ লাখ বছর আগের। এখানে যেটা পাওয়া গেছে, তার চেয়ে কিছু ছোট। তবু ধারণা করতে পারবে।'

একটা বড় কেবিনেটের দরজা খুললেন ডাক্তার।

ভেতরে চেয়েই অস্থির হয়ে গেলেন। 'নেই!' ফিসফিসিয়ে বললেন কোনোমতে। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন। 'নেই! নেই ওটা! চুরি করে নিয়ে গেছে!'

চোদ্দ

সেই বিকেলে ম্যাকম্বারকে একহাত নিলো কিশোর।

ভাড়া চাইতে এলে বললো, ওরা চলে যাচ্ছে। লোকের ভিড় নেই। বাইরেই ক্যাম্প করে রাত কাটাবে।

একধাক্কায় মাচার ভাড়া অর্ধেক করে ফেললো ম্যাকম্বার। পাঁচ ডলার, রাতপিছু।

তাতেও রাজি হলো না কিশোর।

শেষে, তিন ডলারে রফা হলো। টাকা গুণে দিয়ে হাসতে হাসতে মাচায় এসে উঠলো মুসা আর রবিনকে নিয়ে।

অন্ধকারে শুয়ে রইলো ওরা কিছুক্ষণ, নিরবে। ভাবছে, দিনের ঘটনাগুলোর কথা।

নিরবতা ভাঙলো মুসা, 'অবাক কাণ্ড! এই কঙ্কাল চোর এতোদিন ছিলো কোথায়?'

'আজ নিয়েছে, না আগেই নিয়েছে, কে জানে,' রবিন বললো। 'ডাক্তার তো বললেন, মাস তিনেক ধরে আর কেবিনেট খুলে দেখেননি। এর মাঝে যে কোনো সময় চুরি হয়ে থাকতে পারে।'

'হ্যাঁ,' সায় জানালো কিশোর। 'ডাক্তার ক্লডিয়াসের মৃত্যুর সময়ও হতে পারে।'

গুঙিয়ে উঠলো মুসা। 'আবার ক্লডিয়াস! তাঁর সংগে কঙ্কাল চুরির কোনো যোগ থাকতে পারে না। তিনি শুধু সেন্টারে ওটার কাছাকাছি বাস করতেন, ব্যস।'

'লিলির ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না,' বললো কিশোর। 'সে জানে, সেদিন হারবারভিউ লেনে কেন যাচ্ছিলো, কিন্তু বলছে না।'

'হ্যাঁ, জানে,' রবিন বললো। 'দেখলে না, কথা বলার সময় আরেকদিকে চেয়ে ছিলো। তারমানে মিছে কথা বলছিলো?'

'আর কেনই বা ডাক্তার ক্লডিয়াসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক থেকে পাতাগুলো নিখোঁজ হলো? কি লেখা হয়েছিলো ওগুলোতে? তিনিই ছিঁড়েছেন, না অন্য কেউ?'

'অ্যাই, শোনো,' উত্তেজনা ফুটলো রবিনের কণ্ঠে। 'হারবারভিউ লেন আমি চিনি। কাল ওখানে গিয়ে খোঁজ নিলে কেমন হয়? আমি একাই নাহয় যাবো। খুব ছোট লেন। হয়তো কোনো তথ্য জানতে পারবো। বের করে ফেলতে পারবো, কার কাছে যাচ্ছিলেন ক্লডিয়াস।'

'ভালোই হয়,' কিশোর বললো। 'আমি সেন্টারে গিয়ে চেষ্টা করবো তার কাগজপত্র পড়ার।'

'তাহলে আমি যাবো সেন্টারভেলে,' উঠে বসলো মুসা।

'ওখানে কি?' জানতে চাইলো রবিন।

'জানি না। তবে সাইট্রাস গ্রোভের পাশের শহর। আর ওখান

থেকেই এসেছে মুক্তিপণের চিঠি। খোঁজ নিলে আমিও হয়তো কোনো তথ্য জানতে পারবো।'

'খুব ভালো হয়,' বললো কিশোর।

গির্জার ঘড়িতে দশটা বাজলো।

আর কোনো কথা হলো না। ঘুমিয়ে পড়লো ওরা।

সবে যেন চোখ মুদেছে কিশোর, আর অমনি ঝাঁকাতে শুরু করলো তাকে মুসা।

'কী?' চোখ না খুলে জিজ্ঞেস করলো সে।

'আর কতো ঘুমাবে? আটটা বাজে,' মুসা বললো। 'ওঠো, ওঠো।'

রবিন আগেই উঠেছে।

বাইরের কলে হাতমুখ ধুয়ে নিলো ওরা। ভীষণ ঠাণ্ডা। গায়ে কাঁপুনি তুলে দেয়।

কাফেতে এসে পেট ভরে নাস্তা খেলো। তারপর তিনজন চলে গেল তিনদিকে।

সেক্টারের দরজায় এসে দাঁড়ালো কিশোর। পাল্লা খোলা। ভেতর থেকে মিসেস গ্যারেটের কণ্ঠ কানে আসছে।

'কসম খেয়ে বলতে পারি,' জোরগলায় বলছে মহিলা, 'গতকাল ছিলো না ওটা ওখানে। কতো খোঁজা খুঁজেছি।'

ভেতরে উঁকি দিলো কিশোর। মিসেস গ্যারেটকে দেখা গেল। ধূসর একটা উইগ পরেছে আজ, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল।

'বললামই তো, পাবে, খোঁজো ভালোমতো,' বললো আরেক মহিলা। একে আগে দেখেনি কিশোর। নীল ইউনিফর্ম পরেছে,

তার ওপরে শাদা অ্যাপ্রন। হাতে পালকের ঝাড়ন।

'আমি বলছি, খুঁজেছি,' রেগে গেল মিসেস গ্যারেট। 'এখানে অন্তত দশবার খুঁজেছি। কাল ছিলো না।'

আর তর্ক না করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে মুখ বাঁকিয়ে ঝাড়ন হাতে চলে গেল দ্বিতীয় মহিলা।

ফিরে তাকিয়ে দরজায় কিশোরকে দেখলো মিসেস গ্যারেট। 'লিলিকে খুঁজছো? নেই।'

'ডাক্তার হ্যারিসন আছেন?'

'আছে। মুখ, হাউপ!' গাল ফুলিয়ে দেখালো মহিলা। 'তার ঘরে।'

মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে সেখানে চললো কিশোর। ওয়ার্ক-রুমের কাছাকাছি আসতেই কানে এলো ডাক্তারের উত্তেজিত চিৎকার, ধমক। ধুড়ুম-ধাড়ুম করে কি যেন ফেলা হচ্ছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে দ্বিধা করলো কিশোর। টোকা দিলো।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। 'কী?' চেঁচিয়ে উঠলেন হ্যারি-সন। 'কি চাই?'

'ওকে ধমকাচ্ছো কেন?' ভেতর থেকে বললো একটা শান্ত কণ্ঠ, ডাক্তার রুডলফ। আর্মচেয়ারে বসে আছেন।

আবার চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেলেন হ্যারি-সন, কিশোরকে অবাক করে দিয়ে হাসলেন। 'সরি। এসো, ভেতরে।'

ঘরে ঢুকলো কিশোর।

সারা ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বই, কাগজপত্র। টাইপরাইটার

রাখার টেবিলটা কাত হয়ে পড়ে আছে। মেশিনটাও মেঝেতে।

কিশোরের দিকে চেয়ে হাসলেন ডাক্তার রুডলফ। 'দেখে হাঁটো। পা রাখার জায়গা দেখেছ নাকি।'

লজ্জিত হলেন হ্যারিসন। টেবিলটা সোজা করে তার ওপর তুলে রাখলেন মেশিনটা। খসে পড়ে গেল রোলারের ভাঙা একটা গোল মাথা। মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলে গেল।

'দূর!' সেদিকে চেয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলেন হ্যারিসন।

'জিনিসপত্র নষ্ট করার ওস্তাদ ও,' সহকর্মীকে দেখিয়ে বললেন রুডলফ।

'করবো না তো কী?' প্রতিবাদ করলেন হ্যারিসন। 'কার মাথা ঠিক থাকে? এতোসব গণ্ডগোল। তার ওপর ম্যাকস্বারের বাচ্চা দিয়েছে মেজাজ আরও খারাপ করে। বলে বেড়াচ্ছে, আমিই নাকি লোক দিয়ে তার কঙ্কাল চুরি করিয়েছি। যাতে লোকে অন্যরকম ভাবে, সেজন্যে নাকি মুক্তিপণের নোট পাঠিয়েছি। তারপর, আমার কঙ্কালটা লুকিয়ে রেখে রটিয়েছি চুরি গেছে। শয়তান কোথাকার!' কিশোরের দিকে তাকালেন। 'অন্যকে যে বলছে, শুধু তাইই না। আমাকে ফোন করেও বলে একথা। ব্যাটাকে খুন করবো আমি।'

'ও বলে বলুক না, তোমার কি?' বোঝানোর চেষ্টা করলেন রুডলফ। 'কে বিশ্বাস করছে ওর কথা?'

'এখান থেকেও যে কঙ্কাল চুরি গেল,' সাবধানে বললো কিশোর, 'অবাক লাগছে না আপনার?'

'অবাক! মাথাই খারাপ হয়ে গেছে আমার।'

'তারমানে, গুহামানবকে যে চুরি করেছে, এটাও সেই করেছে, এমনও তো হতে পারে।'

ঝট করে চোখ তুললেন হ্যারিসন। 'তাই তো! একথা তো ভাবিনি। কিন্তু কে? আমার কঙ্কালটার কথা তো সেন্টারের বাইরের কেউ জানে না। মিসেস গ্যারেট, ডাক্তার রুডলফ, এই তো?'

'কেন, লিলি জানে তো।'

'ও জানলেও কিছু হবে না। ভীতুর ডিম। হোমিনিড চুরি করার সাহস ওর হবে না। আরে, তাই তো...এখন মনে পড়ছে। আমার ওপর চোখ রাখতো মেয়েটা। হাঁ করে তাকিয়ে থাকতো। আলমারি কিংবা টেবিলের আড়াল থেকে...অদ্ভুত! ভাবিনি তো আগে।'

হেসে উঠলেন রুডলফ। 'ভেবেছে হয়তো, সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেল কিনা লোকটা, দেখিতো। নাহলে আর কি কারণ? দেখো, ওকে সন্দেহ করো না। বাচ্চা মেয়ে। স্কুলের গন্ধ যায়নি গা থেকে। ও চুরি করবে না।'

'তাহলে কে করেছে?' এমনভাবে বললেন হ্যারিসন, যেন রুডলফ জানেন।

'তবে লিলির জানাশোনা আছে অনেকের সংগে,' বললো কিশোর। 'সেন্টারের বাইরেও লোকের সংগে পরিচয় আছে, কথা বলে।'

চোখের পাতা সরু হয়ে এলো হ্যারিসনের। 'তোমার এতো আগ্রহ কেন?'

'আমি আর আমার দুই বন্ধু, গোয়েন্দা,' সহজ গলায় বললো কিশোর।

'গোয়েন্দা?' হাসলেন হ্যারিসন।

'হ্যাঁ,' পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার নাম ছাপা কার্ড বের করে দিলো কিশোর।

'আই সী,' পড়ে বললেন ডাক্তার। 'ভালোই হলো। এখন আমার সব চেয়ে দরকার গোয়েন্দার। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। লিলিকে সন্দেহ করছো তো? অহেতুক। চুরি করার সাহস ওর হবে না।'

'ডাক্তার ক্লডিয়াস পছন্দ করতেন ওকে,' মনে করিয়ে দিলো কিশোর। 'কঙ্কাল চুরি আর ডাক্তার ক্লডিয়াসের রকি বীচে যাওয়ার পেছনে কোনো যোগাযোগ থাকতে পারে।'

'তা কি করে হয়?' প্রতিবাদ করলেন ডাক্তার রুডলফ। 'সেটা তো তিনমাস আগের ঘটনা। গুহামানবের কঙ্কাল তখনও পাওয়াই যায়নি।'

'ডাক্তার ক্লডিয়াস রকি বীচে কেন গিয়েছিলেন, কিছু বলতে পারবেন?'

'না,' জবাব দিলেন হ্যারিসন। 'চাপা স্বভাবের ছিলো। কাউকে কিছু বলতো না।'

'আমার মনে হয় লিলি জানে। কিন্তু সে-ও কম চাপা নয়। বলে না। আরেকটা ব্যাপার, ডাক্তার ক্লডিয়াসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকের মাঝখানের অনেকগুলো পাতা ছেঁড়া। এপ্রিলের শেষ আর মে-র শুরুর। ওগুলোতে নিশ্চয় কোনো সূত্র ছিলো।'

রুডলফের দিকে তাকালেন একবার হ্যারিসন, মাথা ঝাঁকালেন।

'ক্লডিয়াসের ঘরের কোনো কাগজ সরানো হয়নি। যেমন ছিলো, আছে। অন্তত আমরা ধরিনি।'

দেখার জন্যে তিনজনেই চললো ডাক্তার ক্লডিয়াসের ল্যাবরেটরিতে।

কাগজপত্র আর নোটের অভাব নেই। অসংখ্য ফাইল। সুন্দর করে সাজানো গোছানো, ডাক্তার হ্যারিসনের কাগজপত্রের মতো এলোমেলো নয়।

তিনটে ফাইলের ওপরের টাইটেল দৃষ্টি আকর্ষণ করলো কিশোরের: 'রিঅ্যাকশন টাইমস', 'ম্যানুয়াল ডেকসটারিটি', আর 'কমুনিকেশনস স্কিলস'। কিছু নোটবুক আছে। ওগুলোর ওপরে লেখা রয়েছে, 'কেমিকেল স্টিমুলেশন', 'এক্স-রে এক্সপোজার টাইমস', ইত্যাদি। কিছু কিছু লেখা পড়তে পারলেও মানে কিছুই বুঝলো না কিশোর।

'বোঝাতে হলে আরেকজন জেনিটিসিস্ট লাগবে,' বললেন রুডলফ।

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'তবু, বোঝা যায় এমন কিছুও পাওয়া যেতে পারে। যার সংগে যোগাযোগ আছে গুহামানব অন্তর্ধান রহস্যের।'

পাতার পর পাতা উল্টে চললো তিনজনে। খালি খসখস শব্দ।

কিছুক্ষণ পর মুখ তুললো কিশোর। 'এপ্রিলের দশ তারিখের পর, আর কোনো গবেষণার নোট নেই।'

হাতের খাতাটার শেষ পৃষ্ঠাটাও উল্টে দেখলেন হ্যারিসন। 'ঠিকই বলেছো। এটাতে শেষ লেখা রয়েছে পঁচিশে মার্চের নোট।

বাস।'

আরও এক খাতা, ফাইল, নোটবুক ঘাঁটলো ওরা। এপ্রিল ১০-এর পরে আর কিছু পাওয়া গেল না।

'কিন্তু এর পরেও তো কাজ করেছে,' বললেন হ্যারিসন। 'রোজই করেছে। ওসব দিনের নোটগুলো কই?'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকের কাগজের যা দশা হয়েছে, তা-ই হয়েছে,' মন্তব্য করলো কিশোর।

ওয়ার্কবেঞ্চের ওপর গাদা করে রাখা আছে অনেকগুলো ম্যাগাজিন। সব চেয়ে ওপরেরটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টালো কিশোর। ভেতরে একটা 'স্লিপ' পাওয়া গেল। 'প্রোপার্টি অভ দি ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট লাইব্রেরি' ছাপ মারা।

স্লিপটা যেখানে পাওয়া গেল সেই দুটো পৃষ্ঠা পড়ে বললো কিশোর, 'সোডিয়াম পেনটোথ্যাল মগজের ওপর কি ক্রিয়া করে তা-ই পড়ছিলেন ডাক্তার রুডিয়াস।'

'সোডিয়াম পেনটোথ্যাল একটা অ্যানাসথেটিক,' বললেন রুডলফ। 'অনুভূতি নষ্ট করে। বেহুঁশ করে দেয়।'

আরেকটা ম্যাগাজিন তুলে নিলো কিশোর। জার্নাল অভ দি আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন-এর একটা কপি। নাইট্রাস অক্সাইডের ওপর একটা লেখা ছেপেছে।

'আরেকটা অ্যানাসথেটিক,' বললেন হ্যারিসন। 'দাঁতের ডাক্তাররা হরদম ব্যবহার করে। ওরা বলে একে লাফিং গ্যাস।'

আরও ম্যাগাজিন আছে, তাতে আরও আরটিক্যাল। সব ক'টাতেই রয়েছে কোনো না কোনো অ্যানাসথেটিকের ওপর

লেখা।

'ঠিকই আছে,' বললেন রুডলফ। 'প্রায়ই শিম্পাঞ্জীর ওপর অপারেশন চালাতো তো, অ্যানাসথেটিকের দরকার ছিলো।'

'এবং গতকাল পুরো শহরকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়েছে,' কাউকে উদ্দেশ্য করে বললো না কিশোর কথাটা। মনের ভাবনাটাই মুখ ফুটে বেরিয়ে গেছে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করা হলো। কিন্তু ল্যাবরেটরিতে অ্যানাসথেটিকের কোনো নমুনা পাওয়া গেল না। ইথার, সোডিয়াম পেনটোথ্যাল, এমনকি নোভাকেনও নেই।

সেন্টার থেকে বেরিয়ে এলো কিশোর। লিলির কথা ভাবছে। নোটগুলো কি সে-ই গায়েব করেছে? যদি করে থাকে, কেন? পাতাগুলো কি নষ্ট করে ফেলেছে? আবার প্রশ্ন, কেন? কঙ্কাল চুরিতে তার কোনো হাত আছে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, এতোই নিরীহ।

তাই নাকি?

পনেরো

দুপুর নাগাদ মুসার মনে হলো, অযথা সময় নষ্ট করছে। সাইট্রাস গ্রোভের চেয়ে বড় সেন্টারডেল শহর, অন্যরকম। ছোটো সুপার-মার্কেট আছে, চারটে পেট্রোল স্টেশন। ওষুধের দোকানের সামনে না থেমে এখানে বাস থামে সেন্টারডেল হোটেলের সামনে। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লো না মুসার। পড়ার কথাও নয়, কি খুঁজতে এসেছে তা-ই জানে না।

ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছে মুসা, এই সময় চোখে পড়লো ধূলিধূসরিত পুরনো গাড়িটা। শাঁ করে তার সামনে দিয়ে গিয়ে মোড় নিয়ে নামলো আরেকটা শাখাপথে।

ড্রাইভিং সীটে বিল উইলিয়ামস।

সরু পথের দু'ধারে গাছের সারি। তার ভেতর দিয়ে এগিয়ে একটা পুরনো বাড়ির গাড়িবারান্দায় ঢুকলো গাড়ি। দরজা খুলে নামলো বিল, হাতে বাদামী কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট।

দাঁড়িয়ে আছে মুসা।

মিনিট দু'য়েক পরে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো বিল।

গাড়িতে উঠে, আবার এগিয়ে আসতে লাগলো মুসা যেখানে আছে সেদিকে।

আরেকদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলো মুসা, যাতে বিল দেখতে না পায়।

দেখলো না বিল। চলে গেল সাইট্রাস গ্রোভের দিকে।

বাড়িটার দিকে এগোলো মুসা। গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়ালো। এখন কি করবে?

আরেকটা গাড়ি এসে থামলো গাড়িবারান্দায়। দরজা খুলে নামলো একজন মোটা, বয়স্কা মহিলা।

'কিছু চাও?' জিজ্ঞেস করলো।

'না, ম্যা'ম,' দ্বিধা করছে মুসা। সন্তোষজনক একটা জবাব খুঁজছে মনে মনে। 'মানে, বিল উইলিয়ামসকে খুঁজছিলাম। সাইট্রাস গ্রোভে ফিরে গেলে একটা লিফট নিতাম আরকি। ওকে এখানে ঢুকতেও দেখলাম। কিন্তু আমি আসতে আসতে চলে গেল।'

'ডাকলেই পারতে। আজ আর আসবে না।'

'ঠিক আছে। দেখি, বাসেই চলে যাবো।'

'হ্যাঁ, তাই যাও।' গাড়ির ট্রাঙ্ক খুলে জিনিসপত্র নামাতে শুরু করলো মহিলা। মুদি দোকানে গিয়েছিলো। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তাকে মাল নামাতে সাহায্য করলো মুসা।

বিড়বিড় করে ধন্যবাদ দিলো মহিলা। দুই হাত বোঝাই করে এগোলো বাড়ির পাশের দরজার দিকে।

পাশে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলো মুসা, 'আপনি কি মিসেস

উইলিয়ামস ?

'বিলির মা মনে করেছো ? না, আমি বাড়িওয়ালী। আমার এখানে একটা রুম ভাড়া নিয়ে থাকে বিলি।'

হাতের প্যাকেটগুলো রান্নাঘরের টেবিলে নামিয়ে রাখলো মুসা।

'সাইট্রাস গ্রোভে থাকো তুমি ?' জিজ্ঞেস করলো মহিলা। জবাবের অপেক্ষা না করেই বললো, 'গতকাল ওই কাণ্ডটা যখন ঘটলো, পার্কে সবাই ঘুমালো, তখন কোথায় ছিলে। আমি শিওর, পানিতে কোনো ঘাপলা ছিলো। পানি পরীক্ষা করে দেখা উচিত ছিলো।'

'করেছে তো। ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে। কিছু পায়নি।'

মাথা নাড়লো মহিলা। 'যে-ই করেছে, জঘন্য কাজ করেছে। কাল বিলির ওপর খুব রাগ লাগছিলো। অসুখের আর সময় পেলো না। সারাটা সকাল শুয়ে রইলো বিছানায়। এমনিতে অসুখ খুব একটা হয় না তার। কাল সাইট্রাস গ্রোভে গেলে, দেখলে, এসে সব কিছু খুলে বলতে পারতো আমাকে। আমিও যেতাম কঙ্কালটা দেখতে, কিন্তু ভিড়ের কথা শুনে আর যাইনি। গাড়ি পার্ক করারই নাকি জায়গা ছিলো না।'

'তা ঠিক। যাই এখন,' দরজার দিকে পা বাড়ালো মুসা।

'বিলি এলে কিছু বলবো ? কি নাম তোমার ?'

'না, কিছু বলার দরকার নেই। আমার নাম মুসা।'

'আচ্ছা।'

বাস ধরে সাইট্রাস গ্রোভে ফিরে এলো মুসা।

গোলাবাড়ির পেছনে বসে বসে তখন ভাবছে কিশোর। মুসার মুখে সব শুনে বললো, 'সত্যি তাহলে কাল অসুস্থ ছিলো বিল। আমার তো সন্দেহ ছিলো, চুরিতে সে-ও জড়িত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে শক্ত অ্যালিবাই রয়েছে তার।'

ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো মুসা।

একইভাবে বসে নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে চললো কিশোর।

বিকেল চারটেয় ফিরে এসে দু'জনকে ওই অবস্থায়ই পেলো রবিন।

'খবর ভালো ?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'ডক্টর ফিল ডিকসনের সংগে দেখা করতে যাচ্ছিলেন সেদিন ডক্টর ক্লডিয়াস,' জানালো রবিন। 'হারবারভিউ লেনে থাকেন ডক্টর ডিকসন। অ্যানাসথেটিস্ট। শান্তা মনিকার সেইন্ট ব্রেনড্যান হাসপাতালে চাকরি করেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, ডক্টর ক্লডিয়াস কি কোনো ব্রিফকেস ফেলে গেছেন ?—মাথা নাড়লেন। বললেন, সেদিন সারা দিন অপেক্ষা করেছেন ডক্টর ক্লডিয়াসের জন্যে। পরে অবশ্য তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছেন।'

'অ্যানাসথেটিস্ট ? ডক্টর ক্লডিয়াসের বন্ধু ছিলেন ?'

'তাই তো বললেন। ডক্টর ক্লডিয়াস সেদিন কেন দেখা করতে চেয়েছিলেন, বলতে পারলেন না। কথায় কথায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এমন শক্তিশালী কোনো অ্যানাসথেটিক আছে কিনা, যেটা নিমেষে কয়েকশো লোককে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে ?'

'কি বললেন ?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকলো কিশোর।

'নেই। গতকালকের কথা তিনি শুনেছেন।'

'হুম।'

বাড়ির পেছনের দরজা খুলে বেরোলো লিলি। ছেলেদের দিকে একবার মাথা নুইয়ে হনহন করে চললো গোলাঘরের দরজার দিকে।

পেছনে বেরোলো ম্যাকশ্বার। ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'লিলি, কোথায় যাচ্ছো?'

'আমা ফিঙ্গার দাওয়াত দিয়েছে, তার সংগে সাপার খেতে,' না ফিরে জবাব দিলো লিলি।

'তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরো।'

পিকআপটা বের করে নিয়ে চলে গেল লিলি।

সেদিকে তাকিয়ে রইলো ম্যাকশ্বার।

উঠে এলো কিশোর। কাশি দিয়ে ম্যাকশ্বারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, 'চোরের আর কোনো খবর আছে?'

চোখ পাকিয়ে জবাব দিলো ম্যাকশ্বার, 'থাকলেও তোমাকে বলতাম না।' দুপদাপ পা ফেলে চলে গেল বাড়ির ভেতরে।

বিকেলের একটা অংশ কাফেতে বসে খেয়ে আর অ্যানাস-থেটিকের ব্যাপারে আলোচনা করে কাটালো ছেলেরা। বাকি সময় কাটলো শহরে ঘোরাঘুরি করে।

মাঝরাতের পর বাড়ি ফিরলো লিলি। খাটায় শুয়ে এঞ্জিনের শব্দ শুনলো ছেলেরা। বাড়ির ভেতরে ম্যাকশ্বারের কড়া গলা শোনা গেল, এতোক্ষণ কোথায় কাটিয়ে এসেছে লিলি জিজ্ঞেস করছে। দড়াম দড়াম করে বন্ধ হলো দরজা জানালা, তারপর মেয়েকণ্ঠের কান্না আর ফোঁপানী।

'লিলির সংগে খুব দুর্ব্যবহার করে ওরা,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো মুসা।

'চলে যায় না কেন? বয়েস তো যথেষ্ট হয়েছে,' রবিন বললো।

এরপর আর তেমন কিছু ঘটলো না। ঘুমিয়ে পড়লো ছেলেরা।

পরদিন, সোমবার, খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলো ওরা। ম্যাক-শ্বারের বাড়িতে কেউ ওঠেনি, কোনো নড়াচড়া নেই। কাফেতে নাস্তা সারলো।

মেইন রোড ধরে হাঁটছে, এই সময় চোখে পড়লো পিকআপ নিয়ে পেট্রোল স্টেশনে ঢুকছে লিলি।

'গতরাতে বান্ধবীকে নিয়ে নিশ্চয় হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলো ও,' রবিন অনুমান করলো। 'গতকাল ট্যাংকি ভরেছে ম্যাকশ্বার, দেখেছি। আজ সকালেই এতো তেলের দরকার হলো…'

টুং টুং করে ঘণ্টা বাজলো দু'বার। পাম্প বন্ধ করে, ট্যাংক থেকে হোস বের করে, ট্যাংকের মুখে ক্যাপ লাগালো লিলি। টাকা গুণে দিলো অ্যাটেনডেন্টের হাতে।

স্টার্ট নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল পিকআপ।

'দুই গ্যালনের কিছু বেশি,' চলমান গাড়িটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'তারমানে অন্তত চল্লিশ মাইল। সেন্টারভেল পর্যন্ত যাওয়া যাবে, তাই না?'

'হয়তো ওখানে কোনো বান্ধবী-টান্ধবী থাকে,' মুসা বললো। 'কিংবা হয়তো কাল রাতে বেশি ঘোরাঘুরি করে তেল খরচ করে ফেলে ছিলো। এখন চাচার ভয়ে আবার ভরে রেখেছে।'

'আচ্ছা, ওকে সন্দেহ করছি কেন?' নিজেকেই প্রশ্ন করলো

যেন কিশোর। 'আর করছিই যখন, সরাসরি জিজ্ঞেস করে ফেল-লেই পারি। দ্বিধা কিসের?'

'মিছে কথা বলবে,' রবিন বললো। 'আগেও বলেছে।'

'বড় বেশি নিঃসঙ্গ। কে জানে, তেমন করে যদি জিজ্ঞেস করতে পারি, মনের ভার লাঘব করার জন্যেও সব বলে দিতে পারে। জিজ্ঞেস করতে অসুবিধে কি?'

'কিছু না। তবে তুমি একা যেও। আমি থাকছি না সামনে। কথায় কথায় ভ্যাক ভ্যাক করে কেঁদে ফেলে। এতো কান্না আমার সয় না। খুব খারাপ লাগে।'

'আমারও,' মুসা বললো।

'ঠিক আছে, আমি একাই যাবো,' বললো কিশোর।

ম্যাকম্বারের বাড়ি পৌঁছে দেখলো ওরা, লিলি পিকআপ রেখে সেন্টারে চলে গেছে। দুই সহকারীকে রেখে কিশোরও চললো সেন্টারে। দরজায় পৌঁছেই দাঁড়িয়ে গেল। লিলির চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে।

'দেরি হয়েছে কে বললো?' চেঁচিয়ে উঠলো লিলি। 'মোটেই দেরি হয়নি।'

দরজার কাছ থেকে সরে এসে লিভিংরুমের জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো কিশোর।

কেউ নেই। শুধু দেয়ালে বসানো পশুর মাথাগুলো শূন্য নিষ্প্রাণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে।

'কি করেছো সেটা শোনার আমার দরকার নেই,' আবার চেঁচালো লিলি। 'আরেকবার ফোন করো। বলো, এটা একটা

রসিকতা।'

কিশোরের মনে পড়লো, ল্যাবরেটরির বাইরে, হলরুমে যাওয়ার পথে, দেয়ালে ঝোলানো একটা টেলিফোন আছে। টেলিফোনে কথা বলছে লিলি।

'মিথ্যুক!' আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠলো লিলি। 'এরকম করা মোটেই উচিত হয়নি তোমার! আমার কি হবে ভেবেছো?'

খানিক নিরবতা।

তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'বেশ, দেখো, আমি কি করতে পারি।'

খটাস করে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হলো।

জানালার কাছ থেকে সরে গেল কিশোর।

মুহূর্ত পরেই ঝটকা দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো লিলি। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে। ডান-বাঁ কোনোদিকে না তাকিয়ে ধুপধাপ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে, প্রায় দৌড়ে গেল গেটের দিকে।

পিছু নিলো কিশোর। ডাকলো না।

মাঠ পেরিয়ে ম্যাকম্বারের গোলাঘরে ঢুকে পিকআপটা বের করলো লিলি। ঝাঁকুনি খেতে খেতে গিয়ে পথে উঠলো গাড়িটা। ছুটলো শহরের দিকে।

গোলাঘরের দিকে এগোলো কিশোর। দরজায় বেরিয়ে এলো মুসা আর রবিন।

'গেল কই?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'জানি না,' কিশোর জবাব দিলো। 'খুব রেগেছে। অবশেষে করতে চলেছে কিছু একটা।'

'শুধু ও-ই না,' রবিন বললো। 'মিনিট দশেক আগে ম্যাকশ্বারও খুব রেগেমেগে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। ওর স্ত্রী পেছন থেকে ডাকছিলো। গুহামানবের পেছনে আর টাকা নষ্ট না করতে বললো। শুনলোই না যেন ম্যাকশ্বার। শহরের দিকে চলে গেল।'

'মুক্তিপণ।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললো কিশোর, 'মুক্তিপণের টাকা দিতে গেছে। ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করেছে ভালোমতোই।'

ষোল

'চলো, যাই। দেখি, কি করে সামলায় ম্যাকশ্বার।' বলেই রওনা হলো কিশোর।

'কিভাবে করবে?' পেছন থেকে বললো মুসা। 'গাড়ি তো নিলো না।'

'গেলেই দেখবো।'

মেইন রোড ধরে হেঁটে কাফেটা প্রায় পেরিয়ে যাচ্ছিলো ছেলেরা, এই সময় দরজায় বেরোলো ম্যাকশ্বার। তার সংগে রয়েছে কাফের মালিক, মিস্টার মরিসন। পেছনে আরও দু'জন বেরোলো। একজনকে চেনে কিশোর, এখানকার ওষুধের দোকানের মালিক।

দ্রুত পায়ে ব্যাংকের দিকে হাঁটতে লাগলো চারজনে। মাঝপথে তাদের সংগে মিলিত হলো মোটেলের মালিক।

'যা আন্দাজ করেছিলাম,' নিচু কণ্ঠে বললো কিশোর। 'শহরের সব ব্যবসায়ী একজোট হয়ে গুহামানবের পেছনে টাকা ঢেলেছে। মুক্তিপণের টাকাও সবাই ভাগাভাগি করে দেবে।'

পার্কের একটা বেঞ্চে বসে ব্যাংকের ওপর চোখ রাখলো কিশোর। জানালার ভেতর দিয়ে দেখা গেল, তাড়াহুড়ো করে ডেস্ক থেকে উঠে আসছে ব্যাংকের ম্যানেজার। পাঁচজনের সংগেই হাত মেলালো। তারপর ওদেরকে নিয়ে গেল পেছন দিকের একটা কামরায়।

'এবার কি করবো?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'অপেক্ষা,' জবাব দিলো কিশোর। 'বেশিক্ষণ বসে থাকতে হবে না।'

পাঁচ মিনিট পর, গির্জার ঘড়িতে যখন দশটার ঘন্টা বাজছে, ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এলো ম্যাকস্বার। হাতে ক্যানভাসে তৈরি একটা টাকা রাখার বটুয়া। সংগে বেরোলো কাফের মালিক।

দ্রুতপায়ে হেঁটে গেল দু'জনে কাফের পাশের পার্কিং লটে। একটা ফোক্সওয়াগেনে চড়ে চলে গেল।

'এবারও বেশিক্ষণ লাগবে না,' বললো কিশোর।

ব্যাংকের দরজায় দেখা দিলো আরও দু'জন, ম্যাকস্বারের সংগে যারা ঢুকেছিলো। তাদের পেছনে বেরোলো ম্যানেজার। সবাই উদ্বিগ্ন। আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে কাফের কাউন্টারের উল্টোদিকে বুদ-এ বসলো।

বসেই আছে ছেলেরা।

গির্জার ঘড়িতে সোয়া দশটা বাজলো, সাড়ে দশটা। ফিরে এসে পার্কিং লটে ঢুকলো ফোক্সওয়াগেন। গাড়ি থেকে নামলো ম্যাকস্বার, আর তার সংগী। ম্যাকস্বারের হাতে বটুয়াটা নেই। ক্লান্তপায়ে হেঁটে গিয়ে কাফেতে ঢুকলো দু'জনে।

'যাবো নাকি?' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো কিশোর। পার্ক থেকে বেরিয়ে পথ পেরোলো। রবিন আর মুসা চললো তার পেছনে।

বুদের মানুষগুলো ছাড়া আর কেউ নেই কাফেতে, শুধু একজন ওয়েইট্রেস পাত্রে চিনি ঢালছে। ছেলেদের দিকে একবার চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলো ম্যাকস্বার।

বড়দের কাছ থেকে খানিক দূরে বসলো ছেলেরা।

ম্যাকস্বার আরেকবার এদিকে তাকাতেই আন্তরিকতার ভংগিতে হাসলো কিশোর। জিজ্ঞেস করলো, 'চোরের ফোন আসবে?'

ঝুলে পড়লো ম্যাকস্বারের নিচের চোয়াল, বন্ধ হলো আবার।

'টাকা দিয়ে দিয়েছেন, না?' আবার জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

লাফ দিয়ে টুল থেকে নেমে এলো কিশোরের শার্টের কলার চেপে ধরলো ম্যাকস্বার। 'তুমি কি করে জানলে?...চোরের সংগী নাকি? লক্ষ্য করেছি, সারাক্ষণ চোখ রাখো আমার ওপর। কেন?'

কলার ছাড়ানোর চেষ্টা করলো না কিশোর। শান্তকণ্ঠে বললো, 'চোরের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'অ্যাই কিং, কি করছো?' বাধা দিলো কাফের মালিক।

রাগে গোঁ গোঁ করে উঠলো ম্যাকস্বার, কিন্তু কলার ছেড়ে দিলো।

'অপরাধ আমার আর আমার বন্ধুদের হবি,' নাটকের সংলাপ বলছে যেন কিশোর। 'তবে আমরা অপরাধ করি না, অপরাধীকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করি। রহস্যের সমাধান করি।'

কথার ধরন দেখে বড় বড় হয়ে গেল ম্যাকশ্বারের চোখ। ফিরে গিয়ে টুলে বসলো।

'আপনি কি মনে করেন কঙ্কালটা কোথায় রেখেছে জানাবে আপনাকে চোর?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

জবাব দিলো না ম্যাকশ্বার।

কিন্তু কাফের মালিক বললো, 'শিওর হওয়ার উপায় নেই। না-ও বলতে পারে।'

মাথা ঝোঁকালো কিশোর, মরিসনের সংগে একমত।

সময় যেতে লাগলো।

'অন্য কারও হাতে যদি পড়ে টাকা?' একসময় বললো ব্যাংক ম্যানেজার। 'পিকনিক করতে আসে অনেকেই। হয়তো কারও চোখে পড়ে গেল…'

'থামো তো!' হাত তুললো ম্যাকশ্বার। কপালে ঘামের বিন্দু জমছে।

কনুয়ে ভর রেখে কাত হলো রবিন। লোকগুলোকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললো, 'সিনেমায় দেখি, বাস স্টেশনের লকারে জিনিস লুকিয়ে রাখে কিডন্যাপাররা। এখানে তো তেমন বাসস্টেশনও নেই। সবাই নামে ওষুধের দোকানের সামনে।'

ঝট করে সোজা হলো কিশোর। 'কিন্তু রেল স্টেশন আছে!'

পিনপতন নিরবতা নামলো কাফের ভেতরে। পার্কের শেষ মাথা ছাড়িয়ে ওপাশে পুরনো রেল স্টেশনটা, মরিসন আর ম্যাকশ্বারের মুখ ঘুরে গেল সেদিকে। সেই একইরকম রয়েছে ধুলায় ঢাকা পোড়ো বাড়িটা।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো কাফের মালিক।

চোখের পলকে টুল ছাড়লো অন্যেরা। দরজায় আগে পৌঁছলো ম্যাকশ্বার। ছুটে বেরোলো। তার পেছনে অন্যেরা।

কাফে থেকে বেরিয়ে ছেলেরাও দৌড় দিলো স্টেশনের দিকে।

বাড়িটার বারান্দায় উঠে জানালার ময়লা কাচের মধ্যে দিয়ে ভেতরে তাকালো ম্যাকশ্বার।

'হাত দেবেন না!' চেঁচিয়ে সাবধান করলো কিশোর। 'আঙুলের ছাপ লেগে যাবে।'

জানালার কাছ থেকে সরে এসে ছুটে গিয়ে দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ম্যাকশ্বার। কাঁধের ধাক্কায় ছুটে গেল পাল্লার মরচেধরা কব্জা। মড়মড় করে উঠলো তক্তা।

দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল সেখানে। সুপারমার্কেট থেকে দৌড়াদৌড়ি করে এলো লোক। মেয়েরা বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। সেপথ দিয়েই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন ডাক্তার হ্যারিসন, সংগে ডাক্তার রুডলফ। হট্টগোল শুনে দু'জনেই নেমে এলেন। ওষুধের দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার রেডম্যান।

আবার দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ম্যাকশ্বার।

বেশিক্ষণ সইতে পারলো না পুরনো দরজা। ছিটকে খুলে গেল।

স্টেশনের বারান্দায় ওঠার জন্যে হুড়াহুড়ি লাগিয়েছে লোকে।

'সরো!' ধমকে উঠলো ম্যাকশ্বার। 'কোনো কিছুতে হাত দেবে না।'

স্থির হয়ে গেল সবাই।

পুরনো, দোমড়ানো একটা ট্রাংক পাওয়া গেল ঘরের ভেতরে।

ধুলোতে দাগ দেখে বোঝা গেল, জানালা দিয়ে ঢুকিয়ে মেঝের ওপর দিয়ে টেনে আনা হয়েছে ওটা।

'কি ওটাতে?' জিজ্ঞেস করলো কে যেন।

ট্রাংকের ডালা তুলেই সোজা হয়ে গেল মরিসন। অস্ফুট একটা শব্দ বেরোলো মুখ থেকে।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন হ্যারিসন। দেখলেন ট্রাংকে কি আছে। কতগুলো হাড়, কোনটা কোন জায়গার সহজে বোঝার উপায় নেই। খুলির শূন্য কোটরদুটো চেয়ে আছে ছাতের দিকে।

হাঁ হয়ে গেলেন ডাক্তার। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। পাঁই করে ঘুরলেন ম্যাকম্বারের দিকে। 'কি এসব?'

কি ভেবে পিছিয়ে গেল ম্যাকম্বার।

হ্যারিসনের বাহুতে হাত রাখলেন রুডলফ। 'শান্ত হও। থামো।' ম্যাকম্বারের দিকে ফিরে বললেন, 'এগুলো এখানে কিভাবে?... আফ্রিকায় পাওয়া হোমিনিডের কঙ্কাল...'

'বাজে কথা!' চেঁচিয়ে উঠলো ম্যাকম্বার। 'এটা আমার গুহা-মানব।'

কড়া কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিলেন হ্যারিসন। 'তাই নাকি? দেখো তাহলে ভালো করে, লেবেল লাগানো আছে প্রত্যেকটা হাড়ে। নাম্বার, তারিখ, আর কোন জায়গায় কোনটা পাওয়া গেছে, লেখা আছে। পড়ে দেখো।'

'মিস্টার মরিসন!' বাইরে থেকে ডাকলো কেউ। 'মিস্টার ম্যাকম্বার!'

সরে পথ করে দিলো জনতা। ভেতরে ঢুকলো কাকের কাঁ

স্টারম্যান। 'ফোন এসেছে। বললো, স্টেশনঘরে ট্রাংকের মধ্যে আছে...,' ট্রাংকের ভেতরে চেয়েই হাঁ হয়ে গেল। 'এইতো!'

'শুনলে তো?' হ্যারিসনের দিকে চেয়ে হাত নাড়লো ম্যাক-ম্বার। 'ওগুলো আমার হাড়। আমার গুহামানবের। চোরটা নইলে জানলো কিভাবে?' ভুরু কুঁচকে গেল হঠাৎ। জ্বলে উঠলো চোখ। 'শয়তান! ধাপ্পাবাজ! ধাপ্পা দিয়েছো আমাকে!' দু'হাত বাড়িয়ে ডাক্তারের গলা টিপে ধরতে এলো সে। তাকে ধরে ফেললো মরিসন।

ছাড়া পাওয়ার জন্যে ধস্তাধস্তি করতে লাগলো ম্যাকম্বার, চেঁচিয়ে বললো, 'তুমি ব্যাটাই গুহায় গিয়ে কঙ্কালটা গেড়ে রেখে এসেছিলে। তারপর এমন ভাব দেখিয়েছো, যেন পেয়েছো ওখানে। লোকের নজর পড়ুক, বড় ধরনের আলোড়ন হোক, এটা চেয়েছো। আর সেজন্যে ব্যবহার করেছো আমাকে।'

'ব্যাটা বলে কি? মিথ্যুক কোথাকার,' ঘুসি পাকিয়ে এগোতে গেলেন হ্যারিসন, আটকালেন রুডলফ।

ঘরে ঢুকলো ডেপুটি শেরিফ। এগিয়ে এলো।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলো এই সময় কিশোর, ভিড়ের কিনারে দাঁড়িয়ে এদিকে চেয়ে আছেন রেডম্যান। হাসছেন মিটিমিটি। হ্যারিসনের দুরবস্থা দেখেই বোধহয় তাঁর কালো চোখে খুশির ঝিলিক।

সতেরো

'হ্যারিসন সম্মানী লোক,' বললেন রুডলফ। 'সে এরকম কাজ করতে পারে না।'

'নিশ্চয় করেছে।' চেঁচিয়ে উঠলো ম্যাকম্বার। 'চোরটা নাহলে জানলো কিভাবে হাড়গুলো এখানে আছে?'

আগে বাড়লো কিশোর। শান্তকণ্ঠে বললো, 'চোরই রেখেছে এগুলো এখানে।'

'শুনলে তো, হাঁদারাম...,' ম্যাকম্বারের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন হ্যারিসন।

'এক মিনিট, স্যার,' হাত তুললো কিশোর। 'শুনুন। দুই সেট ফসিল ছিলো, না?'

'হ্যাঁ,' বললেন হ্যারিসন।

'পরশু রাতে মিউজিয়ামের সামনে পাহারা দিচ্ছিলো জিপসি ফ্রেনি। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলো, জেগে উঠলো একটা শব্দে। গোলাঘরের মাচায় শুয়েছিলাম আমরা, তার ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। নেমে এসে শুনলাম, একটা গুহামানবকে নাকি

মাঠের দিকে চলে যেতে দেখেছে সে। লম্বা লম্বা চুল, গায়ে ছাল জড়ানো।

'কি দেখেছে ফ্রেনি? গুহামানব তো হতেই পারে না। হয়তো গুহামানবের রূপ ধরে এসে তাকে ধোঁকা দিয়েছিলো কেউ। মিস্টার ম্যাকম্বারের রান্নাঘর থেকে চাবি নিয়ে এসেছিলো, মিউজিয়ামে ঢুকে গুহার কঙ্কালটা তুলে তার জায়গায় রেখে দিয়েছিলো আফ্রিকান কঙ্কালটা। দ্বিতীয় কঙ্কালটা নিয়ে বেরিয়ে এসে, দরজায় তালা লাগিয়ে চলে গিয়েছিলো মাঠের ওপর দিয়ে।'

'পাগল!' বলে উঠলো ম্যাকম্বার। 'ওই পাগলামী কে করতে যাবে?'

'ডাক্তার হ্যারিসনের ওপর যে দোষ চাপাতে চায়, তাঁকে খেলো করতে চায়। সে জানে, আগে হোক, পরে হোক, গুহার কঙ্কাল বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করতে আসবেনই। লেবেল দেখলেই বুঝবেন, ওটা আফ্রিকান, ডাক্তার হ্যারিসন আফ্রিকায় যেটা পেয়েছেন।'

মাথা নাড়লেন রুডলফ। 'তাতে কিছু হতো না। গুহামানবের ছবি নিয়েছে হ্যারিসন, ফটোগ্রাফ। আফ্রিকান হোমিনিডের সংগে আমেরিকানটার পার্থক্য আছে।'

'ছবি দেখে কি সত্যি বোঝা যায়?' প্রশ্ন তুললো কিশোর। 'তাছাড়া কঙ্কালের বেশির ভাগই ছিলো মাটির তলায়। আফ্রিকান হোমিনিডই ওখানে রেখে যে ফটো তোলেননি ডাক্তার হ্যারিসন, তার কি প্রমাণ? বোঝার উপায় আছে?'

'তাই তো সে করেছে,' চেঁচিয়ে উঠলো ম্যাকম্বার। 'সে ওটা রেখেছে। তারপর কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে। মাঝখান থেকে

আমাদের দশ হাজার ডলার গচ্চা।' হ্যারিসনের দিকে ফিরলো। 'সহজে ছাড়বো তোমাকে ভেবেছো? কেস করবো আমি তোমার নামে। জেলের ভাত না খাওয়াই তো...' রাগে কথা আটকে গেল তার। গটগট করে বেরিয়ে গেল।

জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকালেন হ্যারিসন। তারপর ঝুঁকলেন ট্রাংক থেকে হাড়গুলো বের করার জন্যে।

'সরি, ডাক্তার হ্যারিসন,' বাধা দিলো ডেপুটি। 'এগুলো এখন ছুঁতে পারবেন না। আমাদের কাছে থাকবে। আদালতে হাজির করার দরকার হতে পারে।'

মুখ বিকৃত করে ফেললেন হ্যারিসন। তারপর ম্যাকম্বারের মতো বেরিয়ে গেলেন তিনিও।

উত্তেজনা শেষ। পাতলা হতে লাগলো ভিড়।

তিন গোয়েন্দাও রাস্তায় বেরিয়ে এলো, উজ্জ্বল রোদে।

হেসে বললো মুসা, 'হয়ে গেল কেসের সমাধান।'

'না, হয়নি,' বললো কিশোর। 'এখনও জানি না আমরা, কে ওই গুহামানব। জানি না, কে ঘুম পাড়ালো পার্কভর্তি লোককে। আমেরিকান ফসিলটার কি হলো, তা-ও জানি না।'

ম্যাকম্বারের বাড়ির দিকে চললো তিনজনে। অর্ধেক পথ পেরিয়েছে, এই সময় তাদেরকে ডাকলো বিল উইলিয়ামস। পথের মোড়ে গাড়ি রেখে তাতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'কি হয়েছে ওখানে?' স্টেশনের দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে। 'এতো লোক?'

'চোরাই কঙ্কালটা পাওয়া গেছে, একটা ট্রাংকের ভেতরে,'

জবাব দিলো রবিন।

'তাই নাকি? চোর ধরা পড়েছে? মুক্তিপণের টাকা দিয়েছে ম্যাকম্বার?'

'দিয়েছে,' কিশোর বললো। 'সকালে।'

'ভালো করেছে। ঝামেলা গেল। আবার টুরিস্ট জমাতে পারবে।'

'ঝামেলা আছে।' হঠাৎ কি মনে হলো কিশোরের, অন্য প্রসংগে চলে গেল। 'লিলিকে দেখেছেন?'

মাথা নাড়লো বিল। 'না। কেন?'

'না, কয়েকটা কথা ছিলো। মনে হয় সেন্টারভেলে গেছে। আপনিও ওখানে যাচ্ছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। যাবে?'

দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটে বসলো বিল। বাঁকা হয়ে ঘুরে খুলে দিলো পেছনের দরজা।

ডুবুরীর যন্ত্রপাতি সীটের একধারে ঠেলে দিয়ে উঠে বসলো মুসা, তার পাশে রবিন। কিশোর বসলো সামনে, বিলের পাশে।

চলতে শুরু করলো গাড়ি। দোকানপাট আর স্টেশন ছাড়িয়ে এলো। সুইমিং পুলের পাশ দিয়ে চললো। ড্রাইভিং বোর্ডে উঠে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা।

'দারুণ মজা, না?' ওদের দেখিয়ে বললো বিল। 'আমারও খুব ইচ্ছে করে। ইস্, যদি সাঁতার জানতাম।'

শহর থেকে বেরিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে সেন্টারভেলের দিকে ছুটেছে গাড়ি।

পেছনে তাকালো কিশোর। মুসার হাতে ডুবা মাস্কটা। চোখা-চোখি হলো দু'জনের। কথা হয়ে গেল ইঙ্গিতে। মাস্কটা আবার সীটে নামিয়ে রেখে পেছনে হেলান দিলো মুসা।

আড়চোখে বিলের মুখের দিকে তাকালো কিশোর।

হাসি ফুটেছে বিলের ঠোঁটে। ফাঁক হয়ে আছে সামান্য, শিস দেয়ার ভঙ্গিতে।

দু'জনের মাঝখানে, সীটের ওপর পড়ে রয়েছে কয়েকটা চিউইং গামের মোড়ক, একটা প্লাস্টিকের বাক্স—ঢাকনাটা নেই, খালি একটা কোকাকোলার টিন, একটা সবুজ বলপেন, খালি একটা খাম—উজ্জ্বল সবুজ রঙে উল্টোপিঠে লেখা রয়েছে কিছু, বোঝা যায়।

উল্টে, পড়লো কিশোর। একটা লিস্ট। ওপরে, পেট্রোল পাম্প আর একটা অটো সার্ভিস সেন্টারের নাম লেখা রয়েছে। লিস্টের সব চেয়ে নিচের নামটা দৃষ্টি আকর্ষণ করলো তার: সাইনস সার-ভিস, ওয়্যাডলি রোড।

খামটা রেখে দিলো কিশোর। বললো, 'আপনি সাঁতার জানেন না, না?'

'না।'

'তাহলে ওই ডুবুরির যন্ত্রপাতিগুলো কার?'

'আমার এক বন্ধুর।'

'তাই?' কিশোরের কণ্ঠে এমন কিছু ছিলো, তার দিকে না তাকিয়ে পারলো না বিল।

শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে এসেছে গাড়ি। পথের দুই ধারে গাছপালা। ব্রেকে পা রেখে কান পেতে কি শোনার চেষ্টা করছে

বিল। 'কিসের শব্দ?'

'কই?'

'ইঞ্জিনে গোলমাল···শুনছো না?'

পথের পাশে গাড়ি রাখলো বিল। দরজা খুলে বেরোতে শুরু করলো।

পেছনের সীটে ভুরু কোঁচকালো মুসা। 'কই, আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না?'

'কান ভালো না আরকি তোমাদের,' গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে, নিচু হয়ে জানালা দিয়ে ছেলেদের দিকে তাকাচ্ছে বিল। মুখে রহস্যময় হাসি।

জোরে নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। 'ডুবুরীর যন্ত্রপাতির মানে এখন পরিষ্কার হয়েছে। ক্লডিয়াসের ল্যাবরেটরি থেকে এমন কোনো অ্যানাসথেটিক চুরি করা হয়েছে, যেটা ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে পার্কভর্তি লোককে। তারপর হারিয়ে যায়, কোনো চিহ্ন থাকে না। কিন্তু আপনি ওই গ্যাসের মধ্যে শ্বাস নিতে চাননি, এমনকি আপনার চামড়ায় লাগুক, তা-ও চাননি। সেজন্যেই মুখে লাগিয়েছিলেন মাস্ক, পরেছিলেন ওয়েট স্যুট। আর আপনাকে ওই পোশাকে দেখে জিপসি ভাবলো একচোখা, দাঁতালো কোনো দানব। পলকের জন্যে দেখেছিলো তো, ঠিক বুঝতে পারেনি।'

চেয়ে আছে বিল। চেহারায় কোনো পরিবর্তন নেই।

'লিলি আজ সকালে আপনার সংগেই দেখা করতে গিয়েছিলো। কোথায় ও?'

স্প্রে-করার ছোট প্লাসটিকের বোতলটা অনেক দেরিতে দেখলো

কিশোর। ড্রাইভিং সীটের পাশেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছিলো, বের করে হাতে নিয়েছে বিল। ওটার মুখ সই করলো কিশোরের দিকে।

চেঁচিয়ে উঠে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো মুসা।

স্প্রে করলো বিল।

হালকা ভেজা ভেজা কিছু এসে লাগলো ছেলেদের নাকেমুখে।

পরক্ষণেই পিছিয়ে গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলো বিল। আরও সরে গেল পেছনে।

অসাড় হয়ে এলো কিশোরের হাত-পা। শরীরে এক বিন্দু শক্তি নেই। মাথাটা গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে সীটের একপাশে। ঘন হয়ে নামছে অন্ধকারের চাদর, ঢেকে দিচ্ছে সবকিছু। জ্ঞান হারালো সে।

আঠারো

কিশোরের হুঁশ ফিরলো। নাকে লাগছে ভ্যাপসা গন্ধ। কাছেই জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে কারা যেন, নড়ে উঠলো কেউ।

ঘন অন্ধকার।

উঠে বসলো কিশোর। হাতে লাগলো মাটি। অন্ধকারে গুঙিয়ে উঠলো কেউ।

'কে?' হাত বাড়ালো কিশোর।

গায়ে হাত লাগতেই চেঁচিয়ে উঠলো একটা নারীকণ্ঠ।

'লিলি?' বললো কিশোর। 'লিলি অ্যালজেডো?'

'ছাড়ো!' চেঁচিয়ে উঠলো মেয়েটা। 'আমাকে ছেড়ে দাও!'

কাছেই গুঙিয়ে উঠলো মুসা। বিড়বিড় করে কি বললো রবিন।

'আমি, কিশোর,' শান্তকণ্ঠে বললো সে। 'মুসা, তুমি ভালো আছো? রবিন?'

'আ-আমি···ভালো,' জবাব দিলো মুসা। 'আল্লাহরে, কোথায় এলাম?'

'রবিন?' আবার ডাকলো কিশোর।

'ভালো।'

'লিলি,' জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'কোথায় রয়েছি, জানেন?'

'পুরনো একটা গির্জার মাটির তলার ঘরে। লাশ রাখতো আগে এখানে।' ফুঁপিয়ে উঠে নাকি গলায় কাঁদতে শুরু করলো লিলি। 'আর কোনোদিন বেরোতে পারবো না গো। কেউ আমাদের বাঁচাতে আসবে না। হায় হায় গো, আমরা এবার মরবো।'

'মারছে রে!' গুঙিয়ে উঠলো আবার মুসা। 'শুরু হলো। থামুন না, প্লীজ।'

'লিলি, প্লীজ, মাথা ঠাণ্ডা করুন,' অনুরোধ করলো কিশোর। 'বেরোনোর নিশ্চয় পথ আছে। কোনদিক দিয়ে এনেছে আমাদেরকে?'

'সিঁড়ির মাথায় ঢাকনা আছে একটা, ট্র্যাপডোর। ওই পথে। খানিক আগে উঁকি দিয়েছিলো বিল, আমি জেগে গেছি দেখে আরেক দফা স্প্রে করে গেছে নাকের ওপর।' জোরে জোরে শ্বাস টানলো লিলি। কান্না থেমেছে। 'সকালে কথা কাটাকাটি হয়েছে ওর সংগে। ওকে বলেছি, কঙ্কালটা ফিরিয়ে না দিলে শেরিফকে সব বলে দেবো।'

'সেজন্যেই এনে ভরে রেখেছে?' জানতে চাইলো মুসা।

'হ্যাঁ।' কেঁপে উঠলো লিলির কণ্ঠ। 'প্রথমবার হুঁশ ফিরলে অন্ধকার দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। জোরে চেঁচাতেও সাহস হয়নি। যদি কোনো ফাকফোকর থেকে সাপ কিংবা অন্য কিছু বেরিয়ে আসে। চিৎকার শুনে ঢাকনা তুললো বিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। ফোকরের কাছাকাছি যেতেই আবার আমার

নাকে ওষুধ ছিটালো সে। আবার বেহুঁশ হয়ে গেলাম।'

'ওষুধটা নিশ্চয় ডাক্তার রডিয়াসের আবিষ্কার, তাই না?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'হ্যাঁ। ওটার নাম রেখেছিলেন এপ-টোয়েনটি পি। এপ্রিলের তেইশ তারিখে আবিষ্কার করেছেন তো, সেজন্যে। নানারকম পরীক্ষা চালানোর ফলে শিম্পাঞ্জীগুলো খুব দ্রুত বেড়ে উঠছিলো, তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে মরে যাচ্ছিলো। সেটা ঠেকানোর জন্যে ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা করছিলেন তিনি। বানিয়ে বসলেন বেহুঁশ করার ওষুধ।'

'এ-ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যেই হারবারভিউতে যাচ্ছিলেন, তাই না?' বললো কিশোর। 'অ্যানাসথেটিস্ট-এর কাছে। কিন্তু কাজ শেষ করে যেতে পারলেন না। আচ্ছা, ফরমুলাটার কথা আপনিই বিলকে জানিয়েছেন, তাই না? পার্কের লোককে ঘুম পাড়িয়ে গুহামানব চুরি করার ফন্দিটা কার?'

আবার কান্না আশা করেছিলো কিশোর, কিন্তু কাঁদলো না লিলি। বললো, 'ফন্দিটা বিলের। ফরমুলাটার কথা আমি বলেছি। টাকার দরকার ছিলো। কয়েকশো ডলার। তাহলে এখান থেকে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু বেঈমানী করলো সে।'

'এসব কথা তো পরেও জানা যাবে, নাকি?' বলে উঠলো মুসা। 'এখন বেরোনোর চেষ্টা করা দরকার।'

কারও কিছু বলার অপেক্ষা না করেই হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়িটা বের করলো সে। সাবধানে উঠতে শুরু করলো। পিছু নিলো রবিন।

ওপরে উঠে মাথা ঠেকে গেল ট্র্যাপডোরে। দুই হাতে ঠেলে দেখলো মুসা, উঠলো না ঢাকনাটা।

রবিন এসে দাঁড়ালো তার পাশে। দু'জনে মিলে ঠেলাঠেলি করে দেখলো। ঢাকনা তুলতে পারলো না।

'আর কোনো পথ নেই?' বললো রবিন।

'না,' নিচ থেকে জবাব দিলো লিলি। কাঁদতে শুরু করলো। 'আমরা···আমরা ফেঁসেছি ভালোমতো···বিল এসে খুলে না দিলে···হায় হায়, কেন একাজ করতে গেলাম গো···'

'আহ্, কি শুরু করলেন?' বললো কিশোর। 'এখান থেকে ঠিকই বেরিয়ে যাবো আমরা। থামুন তো।'

'এই মুসা,' বললো রবিন। 'গালে বাতাস লাগছে। এই যে, এই দেয়ালটায় ফাঁকটাক কিছু আছে।' সিঁড়ির পাশের দেয়ালের কথা বললো সে।

দেয়ালে হাত বুলিয়ে দেখলো দু'জনে। পুরনো ইট, ভেজা ভেজা। নখ দিয়ে খোঁচা দিলেই নরম মাটির মতো নখের ভেতর ঢুকে যায়। বেরিয়ে থাকা একটা ইটের মাথা ধরে হ্যাঁচকা টান মারলো মুসা। তাকে অবাক করে দিয়ে খুলে বেরিয়ে এলো ওটা। ফোকরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দেখলো সে, ওপাশে আরেক সারি ইট। দুই সারি ইট দিয়ে তৈরি হয়েছে দেয়াল।

কাজে লেগে গেল দু'জনে। সহজেই খুলে আসছে একের পর এক ইট। জোরে ঠেলা দিলে কোনো কোনোটা খুলে পড়ে যাচ্ছে অন্যপাশে। ছোট একটা ফোকর হয়ে গেল দেখতে দেখতে। আলো আর বাতাস এখন দুইই আসছে ওপথে।

মানুষ বেরোনোর মতো একটা ফোকর করে ফেললো ওরা। দু'জনের আঙুলের মাথাই রক্তাক্ত, ব্যথা নিশ্চয় করছে, কিন্তু টের পেলো না উত্তেজনায়।

উঠে এসে কিশোরও হাত লাগালো।

ফোকরের ভেতর দিয়ে মাথা গলিয়ে দিলো মুসা। মাত্র দু'তিন ফুট নিচে মাটি। দেয়ালের বাকি অংশটা মাটির তলায়। সেটা বরং ভালোই হলো ওদের জন্যে।

খুব সহজেই বেরিয়ে চলে এলো ওরা।

সারা গায়ে ধুলোময়লা আর শ্যাওলা, ভূত সেজেছে যেন একেকজন। হাতে পায়ে আঁচড়ের দাগ, কোনো কোনোটা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। লিলির চোখ লাল, কেঁদে কেঁদে ফুলিয়ে ফেলেছে চোখমুখ।

'চলো, শয়তানটাকে ধরি গিয়ে,' বললো লিলি। 'পালানোর আগেই। নইলে লোকের সর্বনাশ করবে সে। এপ-টোয়েন্টি থ্রি-র ফরমুলা এখন তার হাতে।'

'আরও ওষুধ বানিয়ে মানুষকে ঘুম পাড়াবে ভাবছেন?' বললো মুসা।

'তাই তো করবে। ঘুম পাড়াতে পারলে কত কিছুই করা সম্ভব। পকেটের টাকা লুট করা থেকে শুরু করে অনেক কিছু··· চলো, জলদি চলো।'

বনের ভেতর দিয়ে দৌড়ে চললো ওরা। বনের শেষে মাঠ পেরিয়ে গোলাবাড়িতে পৌঁছে দেখলো, ম্যাকথারের গাড়িটা আছে। ইগনিশন কী লাগানোই আছে। পেছনের সীটে এক-

গাদা প্যাকেট, টিন। এইমাত্র বোধহয় মুদির দোকান থেকে এসেছে ম্যাকস্বার।

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসলো লিলি। মোচড় দিলো চাবিতে।

'আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমাদেরকেও নিয়ে যান,' বলতে বলতেই এক টানে পেছনের দরজা খুলে ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিলো মুসা। রবিনও উঠলো। কিশোর উঠে বসেছে লিলির পাশে।

দরজায় দেখা দিলো জেলডা ম্যাকস্বার। চেঁচিয়ে উঠলো।

কিন্তু কানই দিলো না লিলি। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ফেলেছে। গীয়ার বদলে টান দিলো গাড়ি। একটানে উঠে চলে এলো পথের ওপর। ছুটে চললো শহরের দিকে।

'যাচ্ছি কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরলো লিলির। গতি কমিয়ে মুখ ফেরালো কিশোরের দিকে, 'তা···ভাবছি সেন্টারডেলে···'

'ওখানে গেছে বিল, কি করে জানলেন?'

'আর কোথায়···,' থেমে গেল লিলি। দ্বিধায় পড়েছে।

'সামনে কোথাও রেখে আগে শেরিফকে ফোন করুন,' পরামর্শ দিলো কিশোর। চোখ বন্ধ করে বার দুই চিমটি কাটলো নিচের ঠোঁটে। বিলের গাড়িতে যে খামটা দেখেছিলো, সবুজ কালিতে তাতে লেখা ঠিকানাগুলো মনে করার চেষ্টা করলো। চোখ মেললো হঠাৎ। 'ওঅ্যাডলি! ওঅ্যাডলি রোডটা কোথায় জানেন?'

'সেন্টারডেলে। ইনডাস্ট্রিয়াল এরিয়ায়।'

'তাহলে সেখানেই!' চেঁচিয়ে উঠে দু'আঙুলে চুটকি বাজালো কিশোর। 'খামে আরেকটা নাম দেখেছি···হ্যাঁ, সাইনস সারভিস। নিশ্চয় কোনো কেমিকেল কোম্পানীর নাম। এপ টোয়েন্টি থ্রি বানাতে কেমিকেল দরকার। যেহেতু নাড়াচাড়া একটা পড়েছে, আমরা জেনে গেছি, অনেক বেশি ওষুধ বানিয়ে এখন হাতে রাখতে চাইবে সে, পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে।···সে বানাতে জানে তো?'

'জানে,' জবাব দিলো লিলি। 'কলেজে কেমিস্ট্রি ছিলো।'

'তাহলে আর কোনো সন্দেহ নেই। সেন্টারডেলেই গেছে সে। তাড়াতাড়ি ফোন করে আসুন।'

টেলিফোন বুদের সামনে গাড়ি রেখে পকেট হাতড়ালো লিলি। 'ইস্সি, একটাও নেই।'

'এই যে, নিন,' পকেট থেকে কয়েন বের করে দিলো রবিন।

কয়েন ফেলে ডায়াল করার পরে প্রায় ত্রিশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করতে হলো লিলিকে। তারপর রিসিভার তুললো কেউ ওপাশে। 'হ্যালো, আমি লিলি অ্যালজেডো। কিংসলে ম্যাকস্বারের···হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিই। শুনুন, একটা খবর আছে। গুহামানবের কঙ্কাল বিল চুরি করেছে। হ্যাঁ, সেন্টারে কাজ করে যে সে-ই। তাকে ধরতে এখন সেন্টারডেলে যাচ্ছি। ওঅ্যাডলি রোডে, সাইনস সারভিস কোম্পানিতে আছে। আমরা যাই, আপনারা আসুন।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে গাড়িতে এসে উঠলো লিলি। 'আমাদেরকে যেতে মানা করছিলো। লাইন কেটে দিয়েছি।'

সেন্টারডেলের দিকে গাড়ি ছুটলো।

শহর থেকে বেরোতেই গ্যাস প্যাডালে জোরে চেপে বসলো লিলির পা। এক লাফে গাড়ির গতি বেড়ে গেল অনেক। তীব্র গতিতে ছুটলো। শাঁই শাঁই করে পাশ দিয়ে সরে যাচ্ছে গাছপালা। ফ্লোরবোর্ডে পা চেপে ধরেছে ছেলেরা। কোনো মোড়টোড় এলে চাপ আরও বাড়ায়। শরীর সোজা রাখতেই হিমশিম খাচ্ছে। তারপরেও গতি বাড়িয়েই চলেছে লিলি। শান্তশিষ্ট ভীতু মেয়েটা অকস্মাৎ খেপে গিয়েছে।

সবাই নিরব।

পথের পাশের সাইনবোর্ড জানিয়ে দিলো, সেন্টারভেলে প্রবেশ করেছে গাড়ি। ব্রেক চেপে ধরলো লিলি। কর্কশ আর্তনাদ তুললো টায়ার। স্বাভাবিক গতিবেগে গাড়ির গতি নামিয়ে আনলো সে, নইলে পুলিশের ঝামেলায় পড়তে হবে। 'এখন বাধা চাই না,' বললো।

দুটো সুপারমার্কেটের পাশ কাটিয়ে এসে ডানে মোড় নিলো লিলি। পথের দুই ধারে ছোট ছোট দোকানপাট, তার পরে বাড়িঘর। মাঝে মাঝে গজিয়ে উঠেছে বিরাট বিরাট বিল্ডিঙ।

'এটাই ওঅ্যাভলি রোড,' জানালো লিলি।

সাইনস সারভিস খুঁজে বের করতে সময় লাগলো না। পার্কিং লটে বিলির পুরনো গাড়িটা নেই।

'আসেনি নাকি?' চিন্তিত কণ্ঠে বললো লিলি।

'এক কাজ করুন,' নিচের ঠোঁটে বারবার চিমটি কাটছে কিশোর। 'শেরিফের অফিসে চলুন। হয়তো এসে ধরে নিয়ে গেছে ওকে।'

সামনে এগিয়ে মোড় নিতেই দেখা গেল দুটো গাড়ি। সাইনস সারভিসের সীমানার মধ্যে, একটা গুদামের সামনে। শেরিফের গাড়ির পাশেই বিলের পুরনো গাড়িটা। বিল দাঁড়িয়ে আছে শেরিফের গাড়ির জানালার ধারে, হাতে স্প্যু-বটল। স্টীয়ারিং হুইলে মাথা রেখে পড়ে আছে একজন লোক, বোধহয় বেহুঁশ।

এঞ্জিনের শব্দে মুখ ফিরিয়ে চেয়েই প্রায় দৌড়ে গিয়ে নিজের গাড়িতে উঠলো বিল। এঞ্জিন স্টার্ট দিলো। বিকৃত করে ফেলেছে মুখচোখ। গোঁ গোঁ করে উঠেই বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। আবার চাবি ঘোরালো সে। স্টার্ট নিতে চাইছে না এঞ্জিন, থেমে থেমে যাচ্ছে। অবশেষে স্টার্ট নিলো এঞ্জিন। নড়ে উঠলো গাড়ি।

গ্যাস পেডালে পা চেপে ধরলো লিলি। সোজা এগিয়ে যাচ্ছে বিলের গাড়ি সই করে। প্রচণ্ড জোরে গুঁতো লাগালো পুরনো গাড়িটার পেটে। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙলো, ধাতুর সংগে ধাতুর সংঘর্ষে শব্দ হলো বিকট।

ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললো তিন গোয়েন্দা।

যখন চোখ মেললো, দেখলো, ম্যাকস্বারের গাড়ির বাম্পারে আটকে গেছে বিলের গাড়ির পেছনের চাকা। দুটো গাড়ির কোনোটাই নড়তে পারছে না।

মুখ খারাপ করে গাল দিয়ে উঠলো বিল। দরজা খুলে স্প্যু-বটল হাতে দৌড়ে এলো লিলির দিকে।

পেছনের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল মুসা। বিলকে সই করে ছুঁড়ে মারলো হাতের জিনিসটা।

বিলের ঠিক কপালে লাগলো ওটা। টলে উঠলো সে। হাত

থেকে খসে পড়লো বোতল। সে নিজেও হুমড়ি খেয়ে পড়লো পথের ওপর।

সাইরেনের শব্দ শোনা গেল।

ঘ্যাঁচ করে এসে থামলো শেরিফের দ্বিতীয় আরেকটা গাড়ি, বিলের কয়েক ফুট দূরে। পিস্তল হাতে লাফিয়ে নামলো অফিসার। ভুরু কুঁচকে তাকালো পড়ে থাকা দেহটার দিকে, তারপর ছেলেদের দিকে ফিরলো।

'টমেটোর টিন, স্যার,' হাসিতে বত্রিশ দাঁত বেরিয়ে পড়েছে মুসার। 'গাড়ির পেছনের সীটে রাখা ছিলো। তুলে মেরে দিয়েছি।'

উনিশ

পরদিন বুধবার, সকাল।

গ্যাসপার রিসার্চ সেন্টারের চত্বরে বসে রৌদ্রোজ্জ্বল সুইমিং পুলের দিকে তাকিয়ে আছে ডেপুটি শেরিফ। খুব সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করছে। ডিউটি না থাকলে এতোক্ষণে গিয়ে নেমে পড়তো পানিতে।

'বিলের বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ জোগাড় করেছি,' বললো সে। 'ট্রাংকের গায়ে তার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। ওটা চুরি করে এনেছে তার বাড়িওয়ালীর স্টোররুম থেকে।'

বসে থাকা সকলের ওপর চোখ বোলালো ডেপুটি। জেলডা আর কিংসলে ম্যাকস্বার পাশাপাশি বসেছে। সকালে ফোন করেছিলো তাদেরকে রুডলফ, এখানে আসার জন্যে, অবশ্যই ডেপুটির অনুরোধে। আগের রাতটা মিসেস গ্যারেটের বাড়িতে কাটিয়েছে লিলি, দু'জনেই এসেছে এখন। মুষড়ে পড়েছে লিলি, তার বাহুতে হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে মহিলা।

আগের দিন সারাটা বিকেল সেন্টারভেলে শেরিফের লোকের

সংগে কাটিয়েছে তিন গোয়েন্দা, এখানে ওখানে গেছে। তারপর সাইট্রাস গ্রোভে ফিরে এসেছে লিলির সংগে।

ওয়ার্করুম থেকে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার রুডলফ আর ডাক্তার হ্যারিসন। সুইমিং পুল থেকে গা মুছতে মুছতে এসে তোয়ালে গায়ে জড়িয়েই চেয়ারে বসলেন ডাক্তার রেডম্যান।

'আমার গুহামানবের কি হলো, তাই বলুন,' জিজ্ঞেস করলো ম্যাকশ্বার। 'কখন পাবো?'

'ট্রাংকের হাড় তোমার না!' চেঁচিয়ে উঠলেন হ্যারিসন। 'ওগুলো আমার। আফ্রিকান হোমিনিড।'

'দুটো কঙ্কাল ছিলো,' দুই আঙুল তুললেন ডাক্তার রুডলফ। 'আরেকটা কোথায়?'

'এই চোরনীটাকে জিজ্ঞেস করছেন না কেন?' বুড়ো আঙুল দিয়ে লিলিকে দেখালো জেলডা। 'চোরের দোসর। কোথায় লুকিয়েছে বলুক।'

ঝট করে মাথা তুললো লিলি। রাগে চোখ জ্বলছে। 'জানি না।'

'আরি, আবার তেজ দেখায়। এটা এখানে কেন? হাজতে ভরা হয়নি কেন? ধরে আচ্ছামতো কয়েক ঘা লাগালেই পেট থেকে সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসবে কথা। জানে না, হুঁহ্!'

'জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছে,' বললো ডেপুটি।

'জামিন!' খেঁকিয়ে উঠলো ম্যাকশ্বার। 'ওর জামিন হতে গেল কে?'

'আমি,' শান্তকণ্ঠে বললেন হ্যারিসন।

'তুমি? তুমি হওয়ার কে?'

'ওর বস। আসলে জামিন হওয়ার তো কথা ছিলো তোমার। গেলে তো না।'

'যাইনি বলে কি মহাঅন্যায় করে ফেলেছি নাকি?' ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো জেলডা। 'আর যাবেই বা কেন? চোরের শাস্তি হওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ, তা তো হওয়াই উচিত,' মুখ ছুটে গেল লিলির। 'আমার চেয়ে বড় চোরেরা আছে এখানে। তাদের জন্যেই আজ আমার এদশা। নইলে লস অ্যাঞ্জেলস কিংবা স্যান ডিয়েগোতে কলেজে পড়ার কথা এখন আমার।'

'এঁহ্, আবার কলেজে পড়ার শখ। টাকা পাবে কোথায়? চুরি করে?'

'চুরি তো তোমরা করেছো!' মুখের ওপর বললো লিলি। 'আমার বাবার ইনস্যুরেন্সের টাকাগুলো গেল কোথায়?'

জোঁকের মুখে নুন পড়লো যেন, কুঁচকে গেল জেলডা।

থামলো না লিলি, বললো, 'আর আমার বাড়িভাড়া? হলি-উডের বাড়িভাড়া কতো আসে, জানি না আমি, না? কতো টাকা লাগে আমার খেতে, থাকতে?'

কেশে গলা পরিষ্কার করলো ম্যাকশ্বার। 'আহ্হা, অযথা রাগ করছিস তুই, লিলি।' একেবারে বদলে গেছে ম্যাকশ্বারের কণ্ঠস্বর, গলায় যেন মধু ঝরছে। 'যেতে চাইলে যাবি, কলেজে ভর্তি হতে চাইলে হবি, সে তো ভালো কথা। আমরাই সব ব্যবস্থা করে দেবো। স্যান ডিয়েগো, কিংবা ওশনসাইড, যেখানে খুশি গিয়ে লেখাপড়া কর। বাড়ি ভাড়া করে দেবো, খরচ দেবো। আর কি চাস?'

‘আমার বাবা মারা যাওয়ার পর কতো টাকা বাড়িভাড়া এসেছে, তার হিসেব। ইনস্যুরেন্সের টাকা কতো পাওয়া গেছে, কতোটা আমার পেছনে খরচ হয়েছে, তার হিসেব। বাকি সব টাকা আমার চাই।’

‘কতো আর থাকবে,’ হাত ওল্টালো জেলডা। ‘কয়েক শো। বড় জোর হাজারখানেক।’

‘বেশ। তাহলে উকিলের কাছেই যাবো আমি। এসে হিসেব-নিকেশ করুক। যদি একহাজার বাকি থাকে, সেটা আর নেবো না, দান করে দেবো তোমাদেরকে।’

‘নাহয় পাঁচ হাজারই হবে,’ তাড়াতাড়ি বললো জেলডা।

মুচকি হাসলো ডেপুটি। হাত তুললো, ‘থামুন, থামুন, লিলি বড় হয়েছে। ও যদি উকিলের কাছে যেতে চায় যাক না। আপনাদের অসুবিধে কি?’

‘না না...,’ আমতা আমতা করলো ম্যাকশ্বার। ‘আমাদের আর অসুবিধে কি? গেলে যাক না...’

‘হ্যাঁ, এখন তো বড় হয়েছে,’ মুখ কালো হয়ে গেছে জেলডার। ‘পেলেপুষে বড় করেছি। এখন পাখা গজিয়েছে। আট বছরের যখন ছিলো...’

‘আহারে, কি আমার মায়ারে,’ মুখ বাঁকালো লিলি। ‘এনেছো তো টাকার লোভে। দয়া দেখাতে নয়।’

‘আচ্ছা, ওসব কথা পরে হবে,’ বাধা দিলেন ডাক্তার রুডলফ। ‘আসল কথায় আসা যাক। কঙ্কালটা...’

‘আমার কঙ্কাল আমাকে দিয়ে দেয়া হোক,’ বলে উঠলো

ম্যাকশ্বার, ‘ব্যস, আর কিছু চাই না।’

‘সরি,’ বললো ডেপুটি, ‘এই কেসের মীমাংসা হওয়ার আগে দেয়া যাবে না।’

‘অন্য কঙ্কালটাও লাগবে? মানে, এই কেসের জন্যে?’

একসংগে সবগুলো মুখ ঘুরে গেল কিশোরের দিকে।

‘বনের মধ্যে পুরনো একটা গির্জায় পাওয়া যাবে ওটা।’ আবার বললো কিশোর। ‘তাই না, ডাক্তার রেডম্যান?’

পাথর হয়ে গেলেন যেন রেডম্যান।

‘ডাক্তার হ্যারিসনকে খেলো করতে চেয়েছিলেন। ডাক্তার ক্লডিয়াস মৃত, তাঁর পরে যাঁর গ্যাসিপার পুরস্কার পাওয়ার কথা, তাঁর দুর্নাম করে দেয়া গেলে পুরস্কারের তালিকায় সহজেই নাম উঠে যাবে আপনার। দশ লক্ষ ডলার, সোজা কথা তো নয়। মিউজিয়ামে সেরাতে আপনিই ঢুকেছিলেন। মিস্টার ম্যাকশ্বারের রান্নাঘর থেকে চাবি চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার হ্যারিসনের আফ্রিকান হোমিনিডের কঙ্কালটা আগেই চুরি করেছেন, সেটা মিউজিয়ামে রেখে অন্যটা তুলে নিয়ে চলে গেছেন। আফ্রিকান কঙ্কালটা আমেরিকানটার জায়গায় রেখে এমনভাবে আশপাশের মাটি সমান করে দিয়েছেন, যাতে কিছু বোঝা না যায়।

‘মিউজিয়াম থেকে বেরোনোর সময় শব্দ করে ফেলেছিলেন। তাতে জেগে যায় জিপসি ফ্রেমি। তবে সেরকম কিছু ঘটতে পারে ভেবে তৈরিই হয়ে গিয়েছিলেন আপনি। গায়ে পশুর ছাল জড়িয়ে নিয়েছিলেন, সেন্টারে আছে ওরকম ছাল, কয়েক ঘন্টার জন্যে একটা তুলে নিয়ে যেতে অসুবিধে হয়নি আপনার। মাথায় পরে

ছিলেন উইগ, মিসেস গ্যারেটের। সেকারণেই উইগটা অনেক খুঁজেও পাননি মিসেস গ্যারেট, পরদিন আবার যথাস্থানেই পেলেন। তারমানে কাজ শেষ করে এনে আবার জায়গামতো রেখে দিয়েছিলেন আপনি। আর আপনার ওই বিকট সাজসজ্জা দেখে জিপসি ভাবলো, বুঝি গুহামানবটাই জ্যান্ত হয়ে উঠে চলে যাচ্ছে।'

'যতোসব আবোলতাবোল কথা!' বললেন বটে রেডম্যান, কিন্তু গলায় জোর নেই।

'আপনাকে প্রথমে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ রেখেছিলাম,' বলে গেল কিশোর। 'স্টেশনের ঘরে ট্রাংকে কঙ্কালটা পাওয়ার পর আর পারলাম না। ডাক্তার হ্যারিসনের দুর্দশা দেখে কেমন খুশি হয়েছিলেন, মনে আছে? হাসি ফেটে পড়ছিলো আপনার চোখেমুখে। ঢাকতে পারেননি। দেখে ফেলেছিলাম।

'তারপর থেকে নতুন করে ভাবতে বসলাম। পশুর ছাল আর উইগ নির্দেশ করলো সেন্টারের দিকে।

'আমি, মুসা আর রবিন যখন সেদিন গির্জায় গিয়েছিলাম, আপনিও ছিলেন ওখানে। আমাদের দেখে ভয় পেয়ে যান, যদি কঙ্কালটা দেখে ফেলি? তাই ওখানে থাকতেই দেননি। নানারকম কথা বলে সংগে করে নিয়ে এসেছিলেন আমাদের।'

'তোমার বকর বকর থামাবে?' জোর করে হাসলেন রেডম্যান।

'বকর বকর নয়, স্যার, প্রমাণও দিতে পারি। বেশি ভেবেচিন্তে কাজ করেন আপনি, আর তা করতে গিয়েই ভুল করে সূত্র রেখে গেছেন। গুহামানবের পায়ে জুতো থাকার কথা নয়, সেটা বোঝানোর জন্যেই আপনিও পরেননি। সেরাতে আমেরিকান কঙ্কালটা

নিয়ে গির্জায় যাওয়ার সময় মাঠের ধারে নরম মাটিতে আপনার পায়ের ছাপ রেখে গেছেন। সেটার ছাঁচ তুলে এনেছি আমি। আপনার ডান পায়ের একটা আঙুলে দোষ আছে, বুড়ো আঙুলের পরেরটা...'

সবগুলো চোখ ঘুরে গেল রেডম্যানের খালি পায়ের দিকে। তাড়াতাড়ি পা চেয়ারের নিচে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করলেন ডাক্তার, এবং আরেকটা ভুল করলেন। সবাই দেখলো, যা দেখার। আর প্রতিবাদ করে লাভ হবে না বুঝেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'যাই, কাপড় পরে ফেলি। আমার উকিলকেও খবর দিতে হবে।'

'এনথনি, এমন একটা কাজ তুমি করতে পারলে!' বিষণ্ণ শোনালো ডাক্তার রুডলফের কণ্ঠ।

তাঁর দিকে তাকালেন না রেডম্যান। ধীরপায়ে হাঁটতে শুরু করলেন ঘরের দিকে। পিছু নিলো ডেপুটি।

'আমার উকিলকেও খবর দেয়া দরকার,' বাঁকা চোখে ম্যাকস্বারের দিকে চেয়ে বললেন হ্যারিসন। 'একটা ইনজাংকশন জারি করাতে হবে। দ্বিতীয়বার আর আমেরিকান হোমিনিড নিয়ে খেলা জমাতে দেবো না তোমাকে, ম্যাকস্বার।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। গুনগুন করে উঠলেন মনের সুখে।

'পারবে না!' চেঁচিয়ে উঠলো ম্যাকস্বার। 'ওগুলো আমার হাড়!'

'কে বললো?' রসিকতা করলেন রুডলফ। 'তোমার হাড় তো তোমার গায়েই রয়েছে। বলতে পারো, তোমার কোনো নিকট আত্মীয়ের হাড়। তবে সেটা প্রমাণ করতে হবে আদালতে। তার আগে আর গুহামানবের হাড় নিয়ে গুহায় ঢোকাতে পারছো না।'

বিশ

দিন সাতেক পর।

হলিউডের বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে, তাঁর বিশাল ডেস্কের সামনে বসে আছে তিন গোয়েন্দা।

ডেস্কের অন্য পাশে বসে গভীর মনোযোগে একটা ফাইল পড়ছেন পরিচালক। 'গুহামানবের কেসের' ফাইল। যত্ন করে টাইপ করে এনেছে রবিন।

'টেরিফিক!' অবশেষে মুখ তুলে বললেন পরিচালক। ফাইল বন্ধ করতে করতে বললেন, 'আরেকটু হলেই বেরিয়ে যাচ্ছিলো বিল উইলিয়ামস।'

মাথা ঝোঁকালো কিশোর। 'বেশি হেলাফেলা করে ফেলেছিলো, সাবধান থাকলে তাকে ধরা কঠিন হতো। ডাক্তার ক্লডিয়াসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকের পাতাগুলো সে-ই নষ্ট করেছিলো। যাতে কেউ না জানতে পারে, হারবারভিউ লেনে একজন অ্যানাসথেটিস্টের সংগে দেখা করতে যাচ্ছিলেন ক্লডিয়াস। সেটা জানতো

শুধু লিলি। তার মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থাও করে ফেলেছিলো বিল।'

'বোকা মেয়ে,' বললেন পরিচালক।

'গাফিলতির জন্যেই ধরা পড়লো বিল,' আবার বললো কিশোর। 'গাড়ির পেছনের সীটে ডুবুরীর যন্ত্রপাতি ফেলে রাখলো। এমনকি সবুজ বলপেনটাও ফেলে দেয়নি, যেটা দিয়ে মুক্তিপণের টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছিলো। ইচ্ছে করেই বানান ভুল করেছিলো, যাতে সবাই ভাবে, অল্প শিক্ষিত লোকের কাজ।

'মুক্তিপণের টাকা সে নিয়েছিলো সাইট্রাস গ্রোভ আর সেন্টারভেলের মাঝের একটা রেস্ট এরিয়া থেকে, ওখানেই টাকা রেখে আসার নির্দেশ দিয়েছিলো ম্যাকশ্বারকে। টাকার বটুয়া তার গাড়ির বুটেই পাওয়া গেছে। জুতোজোড়াও, যেগুলো পরে গুহামানবের কঙ্কাল চুরি করতে গিয়েছিলো।'

'তাকে সন্দেহ করলে কিভাবে?'

'সাইট্রাস গ্রোভে যতো ঘটনাই ঘটেছে, কোনোটা ঘটার সময়ই সামনে ছিলো না সে। সেটা চোখে পড়ার মতো। পার্কে সারা শহরের লোক যখন বেহুঁশ, তখন সে সেখানে ছিলো না। স্টেশনে ট্রাংকটা যখন পাওয়া গেল, তখনও সে সেখানে এলো না। অথচ কাছাকাছি যারা ছিলো, সবাই এসেছে, কেউ না এসে পারেনি। স্বাভাবিক কৌতূহল।

'যেদিক থেকেই ভাবা হোক, সন্দেহ পড়ে তার ওপর। সেন্টারে তার অবাধ যাতায়াত। লিলির সংগে ভাব। ম্যাকশ্বারের রান্নাঘর থেকে চাবি চুরি করা তার জন্যে সহজ। ডাক্তার ক্লডিয়াসের আবিষ্কৃত ফরমূলাটা লিলির কাছ থেকে জেনে নিতে পারে সে

অনায়াসে।

'কঙ্কাল চুরির সময় সে-যে তার বাসায় ঘুমাচ্ছিলো, এই অ্যালিবাইও ততো শক্ত নয়, সেটা মনে হয়েছে। বাড়িওয়ালীকে বলেছে, সে তার ঘরে ঘুমাবে। বাড়িওয়ালী দেখতে যায়নি, সত্যি সে ঘুমাচ্ছিলো কিনা। সে আছে কিনা, এই খোঁজ নেয়ারও দরকার মনে করেনি। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে এসেছিলো বিল। বাড়িওয়ালী এসে তার ঘরে উঁকি দিতে পারে, এই আশংকা করেনি, কারণ, যতোদিন সে থেকেছে ওবাড়িতে, কোনোদিন, কোনো কারণে একবারের জন্যেও তার ঘরে উঁকি দিতে আসেনি মহিলা।

'গাড়ি নিয়ে সোজা সাইট্রাস রোডে চলে গেল বিল, পানির ট্যাংকের কাছে। শহরের লোক তখন সবাই পার্কে, উত্তেজিত, কেউ লক্ষ্য করলো না তাকে। অটোমেটিক স্প্রিংক্লারের টাইমার সেট করলো সে, পানিতে ওষুধ মেশার ব্যবস্থা করে বেরিয়ে এলো ট্যাংক হাউস থেকে। ঠিক দশটা বিশ মিনিটে আপনাআপনি চালু হয়ে গেল স্প্রিংকলার সিসটেম।

'সিসটেম চালু হতেই সে সোজা চলে গেল মিউজিয়ামে। পরনে স্কুবা স্যুট, মুখে মুখোশ। স্প্রে-বটল থেকে ওষুধ ছিটিয়ে বেহুঁশ করলো জিপসি ফ্রেনিকে। কঙ্কালটা চুরি করে নিয়ে পালালো। হাড়গুলো একটা বস্তায় ভরে নিয়ে এলো স্টেশনের ঘরে, ওখানে আগেই রেখে গেছে ট্রাংকটা। হাড়গুলো ট্রাংকে ভরে বেরিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলো। ডুপলিকেট একটা চাবি আগেই বানিয়ে নিয়েছিলো। চুরির কাজটা খুব সহজেই সারলো সে, কারণ

তখন শহরের সব লোক ঘুমাচ্ছে পার্কে। পুলিশের কাছে নিজেই বলেছে এসব বিল,' দম নেয়ার জন্যে থামলো কিশোর। তারপর বললো, 'লিলির সাহায্যেই ল্যাবরেটরি থেকে অ্যানাসথেটিক চুরি করেছে সে। লিলিকে বলেছিলো, কঙ্কালটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে কোনো মিউজিয়ামে বিক্রি করে দেবে। তাতে হাজারখানেক ডলার আসতে পারে। অর্ধেক দেবে লিলিকে।'

'কিন্তু যখন ম্যাকম্বারের কাছে দশ হাজার ডলার দাবী করে বসলো বিল, লিলি আঁতকে উঠলো। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলো। কাজ হলো না। এমনকি লিলির পাঁচশো ডলার দিতেও রাজি হলো না সে। সব টাকাই নিজে মেরে দিতে চাইলো। তাতেই আরও বেশি রেগেছে লিলি।'

'বোকা মেয়ে,' আবার বললেন পরিচালক।

'তবে, পরে উকিল আর শেরিফের সামনে সব বলে দিয়েছে লিলি। সে-ই এখন সরকার পক্ষের প্রধান স্বাক্ষী। নিজের কুকর্মের জন্যে লজ্জিত। সব দিক বিবেচনা করে বিচারক তাকে জেলে না ঢুকিয়ে একটা ফাইন করে ছেড়ে দেবেন বলে মনে হয়।'

'কিন্তু কঙ্কাল চুরির আইডিয়াটা প্রথমে কার মাথায় এসেছিলো?'

'বলা যায়, দু'জনেরই। কথায় কথায় একদিন ফরমূলাটার কথা বিলকে বললো লিলি। ক্লডিয়াসের মৃত্যুর পর ফরমূলাটা গোপন করে ফেলার পরামর্শ দিলো লিলিকে বিল। তার মনে হয়েছিলো, এই ফরমূলা দিয়ে অনেক কিছু করা সম্ভব। তখনও আর কেউ জানে না ওই ফরমূলার কথা, একমাত্র লিলি আর সে ছাড়া। তাই,

অন্য কেউ কিছু জানার আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক থেকে পাতা-গুলো ছিঁড়ে ফেললো, ফরমূলাটা চুরি করলো।'

'হুঁ,' মাথা দোলালেন পরিচালক, 'অনেক কিছুই করা সম্ভব ওই অ্যানাসথেটিক দিয়ে। ব্যাংকের সমস্ত লোককে ঘুম পাড়িয়ে ব্যাংক লুট করা যায়, জুয়েলারীর দোকান সাফ করে দেয়া যায়, হাজারটা অপরাধ করা যাবে ওই একটিমাত্র অ্যানাসথেটিকের সাহায্যে। কিন্তু একটা ব্যাপার, পানিতে মিশিয়ে দিলো, অথচ ল্যাবরেটরি টেস্টে কিছু পাওয়া গেল না কেন?'

'সেটা ওই অ্যানাসথেটিকের আরেকটা বিশেষত্ব। ছড়ানোর কয়েক সেকেণ্ড পরই সমস্ত লক্ষণ মুছে যায়। একেবারে উবে যায়। কোনো টেস্টেই আর ধরা পড়ে না।'

'খুব বিপজ্জনক। আচ্ছা, রেডম্যানের কি হলো?'

'সম্মানিত লোক, আর অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকেও জেলে ঢোকাননি বিচারক। তবে ফাইন করা হয়েছে। গ্যাসপার সেন্টার থেকে চাকরি গেছে তার। যা বদনাম হয়েছে, আর কেউ তাকে নেবে কিনা, সে-ব্যাপারেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। জেল খাটার চেয়ে বড় শাস্তি হয়েছে তার।'

'সব চেয়ে বড় মার তার জন্যে,' রবিন বললো, 'বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, এবারকার গ্যাসপার পুরস্কারটা তাকেই দেয়া হবে। কারণ, জনহিতকর অনেক বড় গবেষণা করছিলো রেডম্যান। বেশি লোভ করতে গিয়ে সব দিক হারালো লোকটা।'

'হুঁ। ইউনিভারসাল ফেইলিং অভ ক্রিমিনালস,' গম্ভীর হয়ে বললেন পরিচালক। 'সব অপরাধীই ভাবে, সে ধরা পড়বে না।

...হাড়গুলোর কি হলো?'

'ওই সেটই রয়েছে শেরিফের অফিসে, কেবিনেটে তালা মারা,' বললো কিশোর। 'বিলের কেস পুরোপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকবে ওখানেই। ইতিমধ্যে গভর্নরের সংগে দেখা করেছেন ডাক্তার হ্যারিসন। গভর্নরকে বুঝিয়েছেন, পুরো জায়গাটাকে রিজার্ভ এরিয়া ঘোষণা করার পরামর্শ দিয়েছেন। ওখানে আরও হাড় পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। মূল্যবান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হবে সেগুলো। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছেন গভর্নর।'

'ম্যাকথারের কি অবস্থা?'

'প্রায় পাগল। মাথার চুল ছেঁড়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। তাকেও কোর্টে হাজির করিয়ে ছাড়তে পারতো লিলি, কিন্তু ছোট-বেলায় তাকে একটা আশ্রয় তো অন্তত দিয়েছে তারা, এই ভেবে তার উকিলের কাছে যায়নি। ইনস্যুরেন্সের টাকার কথা আর তোলেনি। তবে হলিউডের বাড়িটার দখল নিয়ে নিয়েছে সে। ভাড়াটেদের নোটিশ দিয়ে দিয়েছে। ওরা বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে বাড়িটাকে গার্লস বোর্ডিং বানাবে লিলি। তার মতোই যারা অনাথ, তাদেরকে জায়গা দেবে ওখানে, খুব সহজ শর্তে, আর কম ভাড়ায়। নিজেও ওখানেই থেকে কলেজে পড়বে।'

'খুব ভালো আইডিয়া,' মাথা নাড়লেন পরিচালক। 'খুব ভালো। আর একটা প্রশ্ন। ফরমূলাটার কি হলো?'

'বিলের পকেটে ছিলো। ধরা পড়ার পর চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে। তার কথা, সে যখন পেলো না, আর কারও হাতে পড়তে দেবে না।'

'আহ্‌হা, গেল একটা মহামূল্যবান আবিষ্কার। তবে এক হিসেবে বোধহয় ভালোই হলো। মানুষের উপকারে যেমন আসতো, অপকারেও লাগানো যেতো ওই ওষুধ।' অনেকক্ষণ পর চেয়ারে হেলান দিলেন পরিচালক। মুসার দিকে চেয়ে বললেন, 'তারপর, মুসা আমান, তুমি তো একেবারে চুপ। কি ব্যাপার? খিদে পেয়েছে?'

'না, স্যার,' নড়েচড়ে বসলো মুসা। 'এমনি। ওরাই তো সব বলছে। আমি আর কি বলবো···'

'তোমার টিন ছোঁড়াটা কিন্তু সময়মতো হয়েছিলো,' মৃদু হাসলেন পরিচালক। 'তো, চমৎকার এই কেসের সমাধান উপলক্ষে ফ্রুটকেক আর আইসক্রীম হয়ে যেতে পারে, কি বলো?'

'না, স্যার, কি দরকার···,' মাথা চুলকে বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছে বেয়ারা। দুই হাতে উঁচু হয়ে আছে অনেকগুলো বাক্স। বুঝলো, আগেই অর্ডার দিয়ে রেখেছেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। হাসিতে ঝকঝকে শাদা দাঁত বেরিয়ে গেল সহকারী গোয়েন্দার। বললো, 'থ্যাংকিউ, স্যার, থ্যাংকিউ।'

হাসিটা সংক্রামিত হলো সবার মাঝে।

—: শেষ :—

Grohon // Adhare Alor Pothojatri